

ইসলামের ইতিহাসঃ নবী ও যুদ্ধের গল্প



পরম করুণাময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য, যিনি মানবজাতিকে তাঁর অসীম জ্ঞান ও রহমতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য নবীদের প্রেরণ করেছেন। শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক সকল নবীর উপর, বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মদের উপর, যিনি মানবতাকে অন্ধকার থেকে আলোতে পরিবর্তন করেছেন।

এই বইটি ইসলামী ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সংকলন, যাতে

সকল নবীর জীবন, তাদের দাওয়াত, সংগ্রাম এবং তাদের জাতির ভাগ্য
উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-
এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো অর্থাৎ গাযওয়াত সম্পর্কে বিশেষভাবে
আলোচনা করা হয়েছে যাতে পাঠক শুধু ইতিহাস জানতে পারে না, তা থেকে
শিক্ষা নিয়ে নিজের জীবন গঠন করতে পারে।

ইতিহাস শুধু অতীতকেই পথ দেখায় না, ভবিষ্যতেরও পথ দেখায়। নবীগণের
জীবন মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এবং আল্লাহর রাসূল
(সাঃ) এর অভিযান শুধু যুদ্ধের ইতিহাসই নয় বরং ধৈর্য, ন্যায়বিচার ও
বিচক্ষণতার এক অনন্য উদাহরণ।

এই বইটি সহজ ভাষায়, সংক্ষিপ্ত আকারে, নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে তৈরি
করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠক সহজেই উপকৃত হতে পারেন।
আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে এই প্রচেষ্টাকে কবুল করার এবং সত্য জানার
এবং অনুসরণ করার তৌফিক দান করার জন্য প্রার্থনা করি।

আমিন, বিশ্বজগতের প্রভু।

- | | |
|---|---|
| 1. আদমের গল্প | 2. ইদ্রিস (আঃ) এর ঘটনা |
| 3. হজরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা | 4. হজরত হুদ (আ.) ও আদ সম্প্রদায়ের ঘটনা |
| 5. হজরত সালেহ (আ.) ও সামুদ জাতির কাহিনী | 6. হজরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বিশ্বাস-উদ্দীপক কাহিনী |
| 7. হজরত লৃত (আ.)-এর বিশ্বাস-উদ্দীপক কাহিনী | 8. হজরত ইসমাইল (আ.) |
| 9. হজরত ইসহাক (আ.) | 10. হজরত ইয়াকুব (আ.) |
| 11. হযরত ইউসুফ (আঃ) এর অলোকিক কাহিনী | 12. হযরত শোয়াইবের পরামর্শ ও মাদিয়ান ধরংস |
| 13. হজরত মুসা (আ.)-এর অলোকিক জীবন | 14. হজরত হারুন (আ.)-এর জীবন ও ত্যাগ |
| 15. হজরত খিয়র (আ.) ও হজরত মুসা (আ.) এর অঙ্গুত সফর | 16. হজরত আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্যশীল জীবন। |
| 17. হযরত ইউনুস (আঃ) এর কাহিনী। | 18. হযরত যুলাকিফল (আ.)-এর কাহিনী। |
| 19. হজরত ইলিয়াস (আ.)-এর সত্য ও শিক্ষণীয় ঘটনা | 20. যীশুর একটি সত্য এবং শিক্ষণীয় গল্প |
| 21. হজরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা | 22. হজরত সুলাইমান (আ.)-এর ঘটনা |
| 23. হজরত জাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা | 24. হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এর সঠিক ঘটনা |
| 25. যীশুর গল্প | 26. বদরের যুদ্ধের সঠিক কাহিনী |
| 27. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের ঘটনা | 28. খন্দকের যুদ্ধের গল্প |
| 29. মক্কা বিজয়ের কাহিনী | 30. সালাহ ছদ্মবিয়ার কাহিনী |
| 31. খাইবার আক্রমণের গল্প | 32. হজ্জ আল-ওয়াদার গল্প |

33. নবীজীর মৃত্যুর কাহিনী

35. হয়রত ওমর ফারুক রা.-এর খেলাফতের কাহিনী

37. হয়রত আলী মুর্তজার খেলাফত ও শাহাদাত

39. কারবালার ঘটনা: সত্যের মহান বলিদান

41. ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার ঘটনা এবং তার সময়

43. আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান এবং উমাইয়া খিলাফত পুনরুদ্ধার

45. উমাইয়া খিলাফতের পতন এবং আববাসীয় খিলাফতের সূচনা

47. আবু জাফর আল-মনসুর: আববাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠার গল্প

49. ইমাম আবু হানিফা, মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন কাহিনী এবং হানাফী আইনশাস্ত্র

51. ইমাম শাফেঈ ও শাফেঈ ফিকাহ শাস্ত্রের কাহিনী

53. মামুন আল-রশিদ এবং আববাসীয় খিলাফতে জনের উত্থানের গল্প

55. মামলুক সাম্রাজ্যের উত্থান এবং সালাদিন আইয়ুবীর বিজয়ের গল্প

34. হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খেলাফতের ঘটনা

36. হয়রত ওমর ফারুক রা.-এর খেলাফতের কাহিনী

38. হয়রত হাসান বিন আলীর খেলাফত ও পুনর্বিলম্ব

40. মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান এবং উমাইয়া খিলাফতের সূচনা

42. মক্কায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর খেলাফত ও শাহাদাত

44. হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রাহ.: ন্যায়ের আলো

46. আবু আল-আববাস সাফাহ: আববাসীয় খিলাফতের প্রথম খলিফার গল্প

48. হারুন আল-রশিদের গল্প এবং আববাসীয় খিলাফতের উত্থান

50. ইমাম মালিক ও মালেকী আইনশাস্ত্রের কাহিনী

52. ইমাম আহমদ বিন হাওল এবং হাওলী আইনশাস্ত্রের কাহিনী

54. বাগদাদের ধ্বংস: হালাকু খানের আক্রমণের গল্প

(1)

আদমের গল্প

বহু বছর আগে, যখন পৃথিবী ছিল একটি শূন্য স্থান, যেখানে কোন মানুষ, কোন প্রাণী, এমনকি গাছও ছিল না, ঈশ্঵র একটি মানুষ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীর ধূলিকগা জড়ো করলেন, জল দিয়ে গুঁড়ো করলেন এবং তাতে তাঁর আত্মা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই আদম ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ। যখন তারা চোখ খুলল, তারা তাদের চারপাশে অঙ্গুত আলো দেখতে পেল। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

স্বর্গ এমন একটা জায়গা যেখানে সবকিছু ছিল স্বপ্নের মত। ফুলের বাগানে রঙিন প্রজাপতি উড়ছিল। ঝরনার জল ঝলমল করছিল এবং তার আওয়াজ ছিল মিষ্টি গানের মতো। গাছের ডালে ঝুলে থাকত মিষ্টি ফল—আম, আঙুর, ফল যার নাম কেউ জানত না। আদম (আঃ) হাসিমুখে জান্নাতে ঘুরে বেড়ান। তারা পাথির কথা শুনল, ফুলের গন্ধ নিল এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল।

কিন্তু মাঝে মাঝে তার হৃদয় খালি মনে হতো। তারা ভাবল, এত সুন্দর জায়গায়
আমি একা কেন?

আল্লাহ আদমের অন্তরের অবস্থা জানতেন। সে আদমের পাঁজর থেকে ইভ
নামের এক মহিলা সৃষ্টি ইভ ছিলেন আদমের সঙ্গী ও বন্ধু। আদম হাওয়াকে
দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তারা উভয়েই জানাতে একত্রে চলাফেরা
করতেন, ফলমূল খেতেন এবং আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতেন। আল্লাহ তায়ালা
তাদেরকে বললেনঃ জানাতে যা ইচ্ছা তাই কর, তবে একটি গাছের ফল খাবে
না। এই গাছ তোমাদের জন্য হারাম। আদম এবং হাওয়া মাথা নেড়ে বললেনঃ

"আমরা আল্লাহর আনুগত্য করব।"

কিন্তু স্বর্গে আর একটি প্রাণী ছিল- শয়তান। তিনি এর আগে ফেরেশতাদের
সাথে ছিলেন, তবে মূলত জিনি সে কি আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল এবং আদমকে
ঈর্ষাঞ্চিত করেছিল। একদিন তিনি আদম ও হাওয়ার কাছে এলেন। তিনি
ফিসফিস করে বললেনঃ "এই নিষিদ্ধ গাছ থেকে খাও! যদি তুমি এটা খাও,
তাহলে তুমি চিরকাল জানাতে থাকবে এবং তোমার কোন দুঃখ থাকবে না।"
শয়তান তাদের অন্তরে বারবার ফিসফিস করে। তিনি বললেনঃ "আল্লাহ
তোমাকে ভালো জিনিস থেকে বিরত রাখছেন। এই ফলটি খান এবং দেখুন
কত সুস্বাদু!"

আদম ও ইত্ব গাছের দিকে তাকাল। তার ওপরের ফলগুলো ছিল খুব সুন্দর—

লাল, হলুদ, চকচকে। তারা ভাবল, "আমরা যদি একটু খাই?" কিন্তু ফল
খাওয়ার সাথে সাথে তাদের হৃদয় ভারী হয়ে গেল। তারা তখনই বুঝতে
পেরেছিল যে তারা ভুল করেছে। তারা আল্লাহকে ডাকল: "হে আমাদের প্রভু!
আমরা আমাদের আত্মার প্রতি জুলুম করেছি। শয়তান আমাদের সাথে
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাদের ক্ষমা করুন।"

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "জানাত ছেড়ে পৃথিবীতে চলে যাও। সেখানে
তোমার পরীক্ষা হবে, কিন্তু আমি তোমাকে পথ দেখাব।" আদম ও হাওয়া
কাঁদতে লাগলেন। তারা পৃথিবীতে এসেছিল - এই পৃথিবী স্বর্গের মত ছিল না।
ছিল তাপ, ঠাণ্ডা ও শ্রম। কিন্তু তারা আল্লাহর দিকে ফিরে গেল। তারা বললঃ
হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ভুল করেছি, আমাদের ক্ষমা করুন। আল্লাহ
তাদের তওবা করুন করলেন এবং বললেনঃ যদি তোমরা আমার আনুগত্য কর
তবে আমি তোমাদেরকে জানাতে ফিরিয়ে নেব।

এই গল্প আমাদের শেখায় শয়তানের কথায় কান না দিতে। আমরা যদি কোন
ভুল করি তবে আমাদের সাথে সাথে তওবা করা উচিত, কারণ আল্লাহ
ক্ষমাশীল। আদম এবং ইত্ব পৃথিবীতে মানবতার পিতামাতা হয়েছিলেন।
আমরা সবাই তার সন্তান।

 রেফারেন্সের জন্য ইঙ্গিত:

পবিত্র কুরআন: সূরা আল বাকারা (2:30-39), সূরা আল আরাফ •
 (7:11-25), সূরা বুহা (20:115-123)

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৩৩২৬; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৭৪৭

জীবনী: ইবনে কাসীর, নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 10-15 •

1. আল্লাহ আদমকে কী থেকে সৃষ্টি করেছেন?
2. আল্লাহ আদমকে কোথায় রেখেছিলেন?
3. আদম (আঃ) এর সঙ্গীর নাম কি?
4. আল্লাহ তা আলা কোন গাছের ফল নাখেতে আদম ও হাওয়াকে নির্দেশ দিয়েছেন?
5. শয়তান আদম ও হবাকে কী বলেছিল?
6. আদম ও হবাভুল করার পর ঈশ্বরকে কী চেয়েছিলেন?

ইদ্রিস(আঃ) এরঘটনা-২

বহু বছর আগে, যখন মানুষ পৃথিবীতে নতুন জীবন শুরু করছিল, তখন আল্লাহ একজন বিশেষ নবী প্রেরণ করেছিলেন। তাদের নাম ইদ্রিস (আঃ)। তিনি কি এতই জ্ঞানী ছিলেন যে তার কথা শুনে লোকেরা অবাক হয়ে যেত। তার চোখে ছিল গভীর আলো আর কথায় সত্য। ইদ্রিস (আঃ) এমন একটি শহরে বাস করতেন, যেখানে লোকেরা তাকে অনেক সম্মান করত। তিনি তাদের বলতেন: "আল্লাহর পথই সরল পথ। এটা মেনে চল, তাহলে তোমরা সুখী হবে।"

ইদ্রিস (আঃ) এর বসতি ছিল সবুজ মাঠ আর পাহাড়ের কোলে। সেখানে ছোট ছোট মাটির ঘর ছিল, মানুষ গরু পালন করত। কিন্তু তাদের অনেকেই আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। তারা তাদের ক্ষমতা ও সম্পদ নিয়ে গর্বিত ছিল। ইদ্রিস (আঃ) তাদের কাছে যেতেন এবং বাজারে দাঁড়িয়ে বলতেন: "হে আমার সম্পদায়! তোমরা আল্লাহকে ভুলে গেলে কেন? তিনি তোমাদের সবকিছু দিয়েছেন- এই সবুজ মাঠ, এই ফসল, এই জীবন!" খুব কম লোকই তার কথা

শুনেছে, কিন্তু অনেকেই হেসেছে। তিনি বলতেন: "ইদ্রিস, তুমি শুধু গল্প
বলো। আমাদের দরকার নেই।"

কিন্তু ইদ্রিস হারালেন না। তিনি খুব ধৈর্যশীল ছিলেন। তিনি দিনের পর দিন
মানুষকে বোঝাতে থাকেন। তার হাতে সবসময় একটি কলম এবং কিছু পাতা
থাকত। কথিত আছে, তিনিই পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি যিনি কলম দিয়ে লেখেন।
তিনি আল্লাহ সম্পর্কে লিখতেন যাতে মানুষ পড়তে এবং শিখতে পারে। তার
লেখা দেখে গ্রামের ছেলেমেয়েরা আশ্চর্য হয়ে বলত: "চাচা ইদ্রিস, এসব
নির্দর্শন কি বলে?" তিনি বলতেন: "এগুলি পড়, এবং আপনি কীভাবে একজন
ভাল মানুষ হতে পারেন তা জানতে পারবেন।"

ইদ্রিস (আঃ) শুধু জ্ঞানীই ছিলেন না, অত্যন্ত দক্ষও ছিলেন। তারা কাপড়
সেলাই করতেন। তার সেলাই এত সুন্দর ছিল যে লোকেরা যখন তার শার্ট
দেখত তারা বলত: "এটি একটি দেবদূতের হাতের কাজ!" তিনি বলতেন:
"আল্লাহ তা আমাকে দিয়েছেন এবং আমি আপনাকেও শিখিয়ে দেব।" তার
কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন অনেকেই। তারা ইদ্রিসের কাছে এসে বলতঃ
আমরাও আল্লাহর কথা শুনতে চাই।

একদিন ইদ্রিস (আঃ) শহরের বাইরে একটি পাহাড়ে বসে আল্লাহর সাথে কথা
বলছিলেন। সে বললঃ হে আমার রব! আমি লোকদেরকে তোমার কথা

বলেছি, কিন্তু অনেকেই শোনেনি। আমাকে আরো শক্তি দাও। আঘাত তাদের দোয়া শুনেছেন। তিনি বললেনঃ তুমি আমার বিশেষ বান্দা। আমি তোমাকে উচ্চ পদ দান করব।

সেই রাতে আকাশে উজ্জ্বল আলো ছিল। ফেরেশতারা এসে ইদ্রিস (আঃ)-কে আকাশের এক উঁচু স্থানে নিয়ে গেল। সকালে গ্রামের লোকজন দেখেন ইদ্রিস আর নেই। তারা কাঁদতে কাঁদতে বললোঃ ইদ্রিস আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

কিন্তু যারা তাকে বিশ্বাস করেছিল তারা বললোঃ "না, ইদ্রিস আঘাতৰ কাছে গেছেন। তিনি এখনো আমাদের জন্য দোয়া করছেন।"

কুরআন বলেঃ এবং আমরা তাকে উচ্চস্থানে উঠিয়েছিলাম।" এবং আমরা তাদের উচ্চে উন্নীত করেছি।"

কিছু রেওয়ায়েত অনুসারে, ইদ্রিস বেহেশতে মারা গিয়েছিলেন এবং কেউ বলেছেন যে তিনি জীবিত এবং আঘাতৰ কাছে বিশেষ স্থানে আছেন।

এই গল্প আমাদের শেখায় জ্ঞান শিখতে, সত্য কথা বলতে এবং আঘাতকে ভুলে যেও না। ইদ্রিস (আঃ) এর কলম এবং তার সেলাই করা জামা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের কাজও মানুষকে আঘাতৰ পথে ডাকতে পারে।

 রেফারেন্সের জন্য ইঙ্গিত:

পবিত্র কুরআন: সূরা মরিয়ম (19:56-57), সূরা আল-আম্বিয়া •

(21:85-86)

হাদিস: সহীহ মুসলিম, হাদিস নং 2524 (মিরাজে ইদ্রিস (আঃ)-এর •

সাথে সাক্ষাৎ)

জীবনীঃ ইবনে কাসীর নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 30-35 •

1. ইদ্রিসকীশিখিয়েছিলেন?
2. ইদ্রিসের হাতে সবসময় কী ছিল?
3. ইদ্রিস এত সুন্দর কী সেলাই করেছিলেন?
4. ইদ্রিস কোথায় বসে আল্লাহর কাছে নামাজ পড়তেন?
5. আল্লাহ তাআলাই ইদ্রিস (আঃ) কে কি পুরস্কার দিয়েছেন?
6. কুরআনে ইদ্রিস (আ.) সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?

হজরতনূহ(আ.)-এরঘটনা।-3

বহু বছর আগে, পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। কিন্তু তাদের অনেকেই আল্লাহকে ভুলে গেছে। তারা পাথরের মূর্তি বানিয়ে তাদের পূজা করত এই বলে যে এরা আমাদের দেবতা। দিনরাত তারা পাপ করত, চুরি করত, মিথ্যা কথা বলত এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত। অতঃপর আল্লাহ নূহ নামে একজন নবী প্রেরণ করেন। নোহ লম্বা এবং শক্তিশালী ছিল, এবং তার মুখে একটি শান্ত হাসি ছিল। তাঁর কথায় এমন শক্তি ছিল যে লোকেরা তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত।

নূহ (আঃ) তার সম্প্রদায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন: "হে আমার সম্প্রদায়! মূর্তি পূজা করা বন্ধ কর। একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।" কিন্তু মানুষ হেসেছিল। তারা বললঃ নূহ, তুমি পাগল! আমাদের বাপ-দাদারা এই মূর্তিগুলোর পূজা করত, আমরাও করব। কয়েকজন তার কথা শুনেছিল, কিন্তু বেশিরভাগই তাকে উপহাস করেছিল। তারা বলবে: "আপনি একজন নবী নন, আপনি আমাদের মত মানুষ।"

নৃহ (আঃ) বছরের পর বছর ধরে দিনরাত মানুষকে বোঝাতে থাকেন। তারা

হাটে-বাজারে, ক্ষেত-খামারে, এমনকি মানুষের বাড়িতে গিয়ে বলতেন:

"আল্লাহর দিকে ফিরে যাও, না হলে মহা বিপদ হবে।" বছর কেটে গেল।

কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী নৃহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন ৭৫০ বছর
আল্লাহর দিকে ডাকা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তার কথা শোনেনি। তারা

তাদের অস্বীকার করেছে, তাদের নির্যাতন করেছে এবং তাদের উপহাস

করেছে।

নৃহ (আঃ) কাঁদলেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন: "হে আমার রব!
আমার সম্প্রদায়কে হেদায়েত করুন।" কিন্তু মানুষ খারাপ হয়ে গেল। তখন
আল্লাহ বললেন: "হে নৃহ! এখন কেউ তোমার কথা শুনবেনা। এখন তুমি
একটা জাহাজ বানাও।"

নৃহ অবাক হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ! নৌকা? এখানে সাগর নেই!
আল্লাহ বললেনঃ আমি তোমাকে পথ দেখাব। এরপর নৃহ (আ.) কাজ শুরু
করেন। তারা বসতির বাইরে একটা বড় মাঠে গেল। তারা গাছ কেটে, কাঠ
জড়ো করে এবং একটি বিশাল নৌকা তৈরি করতে শুরু করে। নৌকাটি এত
বড় ছিল যে দেখতে পাহাড়ের মতো। এতে অনেক কক্ষ এবং স্থান ছিল। নৃহ

(ଆମ) ଦିନରାତ ପରିଶ୍ରମ କରତେନ । ତାଦେର ହାତେ ଏକଟି ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ଏକଟି
କରାତ ଥାକବେ ଏବଂ ତାଦେର କପାଳ ଥିକେ ଘାମ ଝରବେ ।

ନୌକା ନିଯେ ଦେଶେର ମାନୁଷ ହେସେଛେ । ତାରା ବଲବେ: "ନୂହ, ଆପଣି ସତିଯିଇ ପାଗଳ!
ଏଖାନେ କୋନ ସମୁଦ୍ର ନେଇ, ଆପଣି ଏହି ଜାହାଜ ଦିଯେ କି କରତେ ଯାଚେନ?" କିନ୍ତୁ
ଶିଶୁ ଆସବେ, ପାଥର ନିକ୍ଷେପ କରବେ ଏବଂ ବଲବେ: "ନୂହ ଚାଚା, ଆପଣି ଜାହାଜେ
କୋଥାଯ ଯାବେନ?" ନୂହ (ଆମ) ବଲତେନଃ ଏଖନୋ ସମୟ ଆଛେ, ତେବା କର । କିନ୍ତୁ
ତାରା ହାସତେ ହାସତେ ଚଲେ ଯେତ ।

ଅବଶ୍ୟେ ସେଇ ଦିନ ଏସେ ଗେଲ । ଆକାଶ କାଳୋ ହେୟ ଗେଲ । ମେଘ ଗର୍ଜନ କରତେ
ଲାଗଲ । ପୃଥିବୀ ଥିକେ ପାନି ଝରତେ ଲାଗଲ ଏବଂ ଆକାଶ ଥିକେ ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ତେ
ଲାଗଲ । ଏହି ଏକଟି ମହାନ ଝାଡ଼ ଛିଲ ! ନୋହ ଦ୍ରୁତ ତାର ପରିବାରକେ ନୌକାଯ ତୁଲେ
ନିଲେନ । ଆଙ୍ଗାହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ, ତାରା ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ୍ତ ଜିନିସେର ଏକଜୋଡ଼ା ସିନ୍ଦୁକେ
ରାଖେ - ଗରୁ, ଛାଗଲ, ହରିଣ, ପାଥି, ଏମନକି ସାପ ଏବଂ ପିଂପଡ଼ା । ନୌକାର ଦରଜା
ବନ୍ଧ ଛିଲ । ପାନି ବାଡ଼ତେ ଲାଗଲ । ଗ୍ରାମ, ମାଠ, ପାହାଡ଼—ସବକିଛୁଇ ତଲିଯେ ଗେଛେ । ତାରା ଚିକାର
କରବେ: "ନୂହ, ଆମାଦେର ରକ୍ଷା କରନ୍ତା!" କିନ୍ତୁ ନୂହ (ଆମ) ବଲଲେନଃ ଏଖନ ଏକମାତ୍ର
ଆଙ୍ଗାହି ରକ୍ଷା କରତେ ପାରେନ ।

নৌকাটি পানিতে ভাসছিল। পানি এত বেশি ছিল যে পৃথিবীর সবকিছুই ডুবে গিয়েছিল। নূহ ও তার পরিবার নৌকায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে থাকে। অনেকক্ষণ পর আল্লাহ বৃষ্টি থামিয়ে দিলেন। পানি কমতে শুরু করেছে। নৌকা জুড়ি মাউন্টেন কিন্তু গিয়ে থেকে গেল।

নূহ পৃথিবীর দিকে তাকাল। সবকিছু পরিষ্কার করা হয়েছিল। আল্লাহ বললেনঃ হে নূহ! এখন নতুন করে জীবন শুরু কর। আমাকে স্মরণ কর। নূহ এবং তার সঙ্গীরা জাহাজ থেকে নেমে পৃথিবীতে একটি নতুন জীবন শুরু করেছিলেন।

নূহ (আঃ) এর কাহিনী আমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য করতে, ধৈর্য ধরতে এবং পাপ থেকে দূরে থাকতে শেখায়। তাদের নৌকা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ তার নেক বান্দাদের ভুলে যান না।



রেফারেন্সের জন্য ইঙ্গিত:

পবিত্র কুরআন: সূরা হুদ (11:25-49) •

পবিত্র কুরআন: সূরা নূহ (71:1-28) •

হাদীসঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৪২ •

হাদীসঃ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৭৮ •

জীবনীঃ ইবনে কাসীর নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 50-65 •

1. হ্যরতনূহসাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকোন ইবাদত করতে নিষেধ করেছিলেন?
 2. কত বছর নূহ(আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?
 3. ঈশ্বর নোহকে কী করার আদেশ দিয়েছিলেন?
 4. নোহ জাহাজে কী নিয়ে গিয়েছিলেন?
 5. কোথায় গেল নৌকা?
 6. জাহাজে বসে নোহ কী করেছিলেন?
-

(4)

হজরত হৃদ (আ.) ও আদসম্প্রদায়ের ঘটনা

বহু বছর আগে, পৃথিবীতে একটি জাতি বাস করত সে ফিরে এল এই জাতি খুব শক্তিশালী ছিল। তারা পাহাড়ের মতো উঁচু প্রাসাদ তৈরি করেছিল যা আকাশ ছোঁয়া বলে মনে হয়েছিল। তাদের শহরে পাথরের বড় বড় স্তুপ ছিল, যেন পৃথিবীর মুখে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাদের ক্ষমতা ও সম্পদ নিয়ে গর্বিত ছিল। তারা বলতেন: "আমরা এত শক্তিশালী যে কেউ আমাদের পরাজিত করতে পারেনা!" কিন্তু তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তারা পাথরের মূর্তি তৈরি করেছিল এবং তাদের পূজা করেছিল এই বলে: "এই মূর্তি গুলি আমাদের রক্ষা করবে।"

হজরত হৃদ (আ.) ছিলেন লম্বা, শান্ত ও গন্তীর। তাঁর চোখে সত্যের আলো ছিল এবং তাঁর কথায় এমন শক্তি ছিল যে লোকেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা আদ জাতির মাঝখানে একটি বড় ময়দানে দাঁড়াল। তার চারপাশে লোকজন জড়ো হয়। হজরত হৃদ উচ্চকণ্ঠে বললেন: "হে আমার সম্প্রদায়! মূর্তিপূজা ত্যাগ কর! একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি তোমাদের এই

କ୍ଷମତା, ଏହି ପ୍ରାସାଦ, ଏହି ଜୀବନ ଦିଯେଛେନ । ତାଁର କାହେ ଫିରେ ଯାଓ, ତିନି
ତୋମାଦେର ଆରଓ ଦେବେନ ।"

କିନ୍ତୁ ଆଦ ସମ୍ପଦାୟର ସର୍ଦୀରରା ହାସଲ । ଏକଜନ ଧନୀ ଲୋକ ବଲଲ: "ହୁଦ, ତୁମି କି
ବଳଛ? ତୁମି କି ଆମାଦେର ପ୍ରାସାଦ ଓ ଶୁଣ ଦେଖଛ ନା? ଆମରା ଆମାଦେର ଭାଗ୍ୟ
ନିଜେଇ ତୈରି କରି । ଆମାଦେର କୋନ ଦେବତାର ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ!"

କିନ୍ତୁ ହଜରତ ହୁଦ ସାହସ ହାରାନନି । ତିନି ଖୁବ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଛିଲେନ । ତାରା ବାଜାରେ
ଗିଯେଛିଲ, ସେଥାନେ ଲୋକେରା ଫଳ ଏବଂ କାପଡ଼ ବିକ୍ରି କରେଛିଲ । ତିନି ରାନ୍ତାୟ
ଦାଁଡିଯେ ବଲତେନ: "ହେ ଆମାର ସମ୍ପଦାୟ! ତୋମରା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୟେ ଯାଚ୍ଛ । ଏହି
ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଲୋ ତୋମାଦେର କିଛୁଇ ଦିତେ ପାରବେ ନା । ଆଙ୍ଗାହର କାହେ ତୋବା କର, ତିନି
କ୍ଷମାଶୀଳ ।"

କିଛୁ ଗରୀବ ମାନୁଷ ଓ ଶିଶୁ ତାର କଥା ଶୁଣନ୍ତ । ତାରା ହଜରତ ହୁଦେର କାହେ ଏସେ
ବଲତ: ହୁଦ ଚାଚା, ଆମରା ଆପନାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରି । ଆମାଦେର ପଥ ଦେଖାନ । କିନ୍ତୁ
କୁଠ ହୟେ ଓଠେନ ଜାତିର ମହାମାନବ ଓ ପ୍ରଧାନରା । ତାରା ବଲଲ: "ହୋଦ, ଆପନି
ଆମାଦେର ଲୋକଦେର ବିପଥେ ନିଯେ ଯାଚେନ । ଚୁପ କରନ, ନଇଲେ ଆମରା
ଆପନାକେ ଶହର ଥେକେ ତାଡିଯେ ଦେବ!"

হজরত হৃদ (আ.)-এর কোনো ভয় ছিল না। তিনি বললেন: "আমি তোমার কাছে কিছু চাই না। আমি শুধু আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিচ্ছি। তুমি আমাকে যত খুশি ভয় দেখাও, আমি বাধা দেব না।"

আদ সম্প্রদায় আরও হঠকারী হয়ে উঠল। তাদের প্রাসাদে বড় বড় পাটি হতো। তারা গান বাজনা করত, খাওয়া-দাওয়া করত এবং হজরত হৃদের কথা

শনে হাসত। তাদের প্রধানরা বলত: "হৃদ আমাদের ভয় দেখায়। আমাদের কিছুই হবে না। আমাদের প্রাসাদগুলো আমাদের রক্ষা করবে!"

কিন্তু একদিন সব বদলে গেল। আকাশে মেঘ কমতে শুরু করেছে। বৃষ্টি থেমে গেল। সবুজ মাঠ শুকিয়ে গেছে, নদীতে পানি কমে গেছে। মানুষ হতবাক। কেউ কেউ বলেছেন: "কি হচ্ছে?" হযরত হৃদ (রাঃ) বললেনঃ এখনো সময় আছে, তওবা কর! কিন্তু তারা হাসল। তারা বলল: "খরা? আমাদের প্রাসাদ আমাদের রক্ষা করবে!"

দুর্ভিক্ষ তীব্র হয়েছে। ফসল মরেছে। মানুষ ক্ষুধার শিকার হয়েছে। কিন্তু তারা হজরত হৃদের কথা শোনেনি।

তারপর এলো ভয়ানক দিন। দূর আকাশে কালো মেঘ দেখা দিল। মানুষ খুশি ছিল। তারা বলল: "বৃষ্টি হচ্ছে! আমরা বেঁচে গেলাম!" কিন্তু হজরত হৃদের মুখ

গভীর হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ এটা বৃষ্টি নয়, এটা আল্লাহর শাস্তি।

মেঘের কাছাকাছি আসতেই শুরু হলো ভয়ানক ঝড়। এটা কোন সাধারণ ঝড় ছিল না, এটা ছিল আল্লাহর গজব। বাতাস এতই প্রবল ছিল যে প্রাসাদের দেয়ালগুলো কেঁপে উঠল। পাথরের স্তুপগুলো পড়ে যেতে থাকে। লোকেরা চিংকার করে দৌড়ে গেল, কিন্তু কোথাও আশ্রয় পাওয়া গেল না।

এই বাতাস সাত রাত আট দিন আল্লাহ রাগার্বিত না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রাসাদগুলো ধূলায় পরিণত হয়েছে। শহরটি বালির নিচে চাপা পড়ে যায়। যারা হজরত হৃদকে অমান্য করেছিল তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের চিংকার বাতাসে হারিয়ে গেল। শুধুমাত্র হজরত হৃদ ও তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গীরা বেঁচে ছিলেন।

আল্লাহ তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলেন।

ঝড় প্রশংসিত হলে হজরত হৃদ ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। তারা কেঁদেছে, কিন্তু যারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে তাদের জন।

হজরত হৃদের ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, অহংকার ও হঠকারিতা ধ্বংস দেকে আনে। আল্লাহর আনুগত্যই মুক্তির একমাত্র পথ। আদ জাতির প্রাসাদ ও

স্তন্ত্রগুলো আজ বালির নিচে চাপা পড়ে আছে। এটা আমাদের মনে করিয়ে
দেয় যে আল্লাহর ক্ষমতার সামনে কিছুই অবশিষ্ট নেই।

 **রেফারেন্সের জন্য ইঙ্গিত:**

পরিত্র কুরআন: সূরা হৃদ (11:50-60) •

সূরা আরাফ (৭:৬৫-৭২) •

সূরা আল-হাকা (69:6-8) •

হাদীসঃ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৭৬ •

জীবনীঃ ইবনে কাসীর নবীদের গল্প, পৃ. 75-80 •

1. আদজাতি কিসের জন্য গর্ব করেছিল?

2. হ্যরত হৃদ (রাঃ) মানুষকে কোন ইবাদত করতে নিয়ে থ

করেছিলেন?

3. হৃদের কথা কে শুনেছে?

4. আদের লোকের হৃদকে কি হমকি দিল?

৫. আল্লাহতা'আলা আদসম্প্রদায়কে কি শান্তি দিলেন?

৬. কারা বেঁচে গেল বাড়?

(5)

হজরতসালেহ(আ.) ও সামুদ্জাতির কাহিনী

বহু বছর আগে পৃথিবীতে 'সামুদ' নামে এক জাতি ছিল। এই জাতি ছিল অত্যন্ত মেধাবী। তারা ছুরি দিয়ে পাহাড় খোদাই করে দুর্গের মতো বাড়ি তৈরি করেছিল। তাদের শহর পাথরের এক অঙ্গুত দৃশ্য উপস্থাপন করেছিল। প্রতিটি ঘরের দরজা খোদাই করা ছিল এবং দেওয়ালগুলি পালিশ করা পাথর দিয়ে খোদাই করা ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন একজন দক্ষ শিল্পী দিনরাত কষ্ট করে সেগুলো খোদাই করেছেন। তারা তাদের হাতের কাজ এবং শক্তির জন্য গর্বিত ছিল। তারা বলতেন: "আমরা যা খুশি তাই করতে পারি, কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না!" কিন্তু তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তারা পাথরের মূর্তি তৈরি করেছিল এবং তাদের পূজা করেছিল এই বলে: "এই মূর্তিগুলি আমাদের শক্তি দেয়।"

হজরত সালেহ (আ.) অত্যন্ত শান্ত ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তার মুখে ছিল ফুলের পাপড়ির মতো মৃদু হাসি, কিন্তু তার কথায় ছিল সত্ত্বের আলো। তার চোখে এমন ওজ্জ্বল্য ছিল যে লোকে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তিনি সামুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বড় পাথরের মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন। তার
চারপাশে লোকজন জড়ো হলো—ধনী, দরিদ্র, শিশু, সবাই।

হজরত সালেহ (আ.) উচ্চকঢ়ে বললেন,
"হে আমার সম্প্রদায়! এই মূর্তির পূজা করা হেড়ে দাও। একমাত্র আল্লাহর
ইবাদত কর। তিনি তোমাদের এই পর্বত, এই শক্তি, এই জীবন দিয়েছেন। তাঁর
কাছে ফিরে যাও, তিনি ক্ষমাশীল।"

কিন্তু সামুদ্রের সর্দাররা হাসল। তাদের মধ্যে একজন মহান নেতা, যার নাম ছিল
জুন্দব, তিনি বলেছিলেন:
"সালেহ! তুমি কি বলছ? তুমি কি আমাদের পাথরের ঘর এবং ক্ষমতা দেখতে
পাচ্ছ না? আমরা আমাদের ভাগ্য নিজেই তৈরি করি। আমাদের ঈশ্বরের
প্রয়োজন নেই!"

হজরত সালেহ (আ.) নিরাশ হননি। তিনি খুব ধৈর্যশীল ছিলেন। তারা বাজারে
গিয়েছিল, যেখানে লোকেরা গম, ফল এবং কাপড় বিক্রি করেছিল। তারা
পাহাড়ি পথ ধরে হেঁটেছিল, যেখানে ঘরগুলি সূর্যের আলোতে ঝলমল করে।
তিনি প্রতিমার মন্দিরে গিয়ে বললেন:

"হে আমার সম্প্রদায়! এই মূর্তিগুলো তোমাদের কিছুই দিতে পারবে না।

আল্লাহর কাছে তওবা কর। আমি যদি তাঁর আনুগত্য না করি, তাহলে আমি
ধর্ম হয়ে যাব।"

কিছু গরিব মানুষ ও শিশু তার কথায় বিশ্বাস করল। তিনি হজরত সালেহ

(আ.)-এর কাছে এসে বললেন:

"আঙ্কেল সালেহ! আমরা আপনার আনুগত্য করব। আমাদের পথ দেখান।"

কিন্তু প্রধানরা রেগে যান। তিনি বললেনঃ

"হে সালিহ! তুমি আমাদের লোকদের পথভ্রষ্ট করছ! চুপ কর, নইলে আমরা
তোমাকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেব!"

অতঃপর সর্দারগণ হ্যরত সালেহ (আঃ)-কে ডেকে বললেনঃ

"আপনি যদি সত্যিই একজন নবী হন, আমাদের একটি নির্দশন দেখান। আপনি
একটি অলৌকিক ঘটনা না দেখা পর্যন্ত আমরা আপনাকে বিশ্বাস করব না।"

হ্যরত সালেহ (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেনঃ

"হে আল্লাহ! আমার লোকদের তোমার পথ দেখাও।"

আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন। হঠাৎ একটি বিশাল পাথর বিদীর্ণ হল এবং
তা থেকে একটি বড় উট বের হল। এটি কোন সাধারণ উট ছিল না - এটি ছিল
আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অলৌকিক ঘটনা। তার গায়ের রং সোনালী, এবং

তার চোখ শাস্তি ছিল। তার থলি থেকে পুরো শহরের জন্য যথেষ্ট দুধ পাওয়া
গেছে। লোকজন অবাক হয়ে দেখছিল। শিশুরা আনন্দে চিৎকার করে বললঃ
"দেখ! কি মুন্দর উট এটা!"

হ্যরত সালেহ (আঃ) বললেনঃ
"এই উটটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নির্দশন। এটিকে আপনার কৃপের পানি
পান করতে দিন। এটিকে মাঠে মুক্তভাবে বিচরণ করতে দিন। এর ক্ষতি
করবেন না। ক্ষতি করলে আল্লাহর শাস্তি আসবে।"

গরিব মানুষ ও সাধারণ নাগরিকরা উটের দুধ পান করতেন। তিনি বললেনঃ
"এটি সতিয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অলৌকিক ঘটনা!"
আর তারা হজরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।

কিন্তু প্রধানরা বলেছেনঃ
"এই উট আমাদের পানি নষ্ট করছে। কেন আমাদের শহরের চারপাশে ঘুরে
বেড়ায়?"
তাদের অহংকার তাদের হাদয়কে পাথরের মত কঢ়িন করে তুলেছিল। হজরত
সালেহ (আ.) বারবার সতর্ক করেছেনঃ
"এই উটকে রক্ষা কর। যদি তুমি এর ক্ষতি কর, তবে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

কিন্তু সর্দাররা একটা ভয়ানক পরিকল্পনা করল। তিনি শহরের সবচেয়ে বাজে

বখাটেদের মধ্যে নয়জনকে ডেকে বললেন:

"এই উটটিকে মেরে ফেল। তাহলে সালেহের পরবশেষ হবে।"

একদিন রাতে চাঁদের আলো জ্ঞান হয়ে গেলে তারা উটের কাছে ছুটে গেল।
তারা তাদের তরবারি বের করে উটকে আক্রমণ করে। উটটি ব্যথায় চিংকার
করে মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে তার রক্ত পড়তে থাকে। শহরবাসী আনন্দে

হাততালি দিয়ে বলল:

"এখন সালিহের অলৌকিক ঘটনা শেষ! আমরা জিতেছি!"

পরদিন সকালে হজরত সালেহ (আ.) শহরে এলেন। তারা উটের লাশ
দেখতে পান। মুখ গন্তীর হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ
"তুমি আল্লাহর নিদর্শনকে হত্যা করেছ। এখন তিন দিনের মধ্যে তোমার উপর
আঘাত আসবে।"

লোকে হাসতে লাগল।

"তিন দিন? আমাদের পাথরের ঘর আমাদের রক্ষা করবে!"

কিন্তু তাদের মনে এক অজানা ভয় জেগে উঠল।
প্রথম দিনেই আকাশ হলুদ হয়ে গেল।
পরদিন আকাশ লাল হয়ে গেল।

তৃতীয় দিনে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল।

মানুষ ভয়ে কেঁপে উঠল:

"কি হচ্ছে?"

তৃতীয় দিনের সকালে একটি ভয়ানক শব্দ হল - যেন হাজার হাজার বিদ্যুত
একসাথে আঘাত করেছে। এটা ছিল আল্লাহর শাস্তি। আওয়াজ এতটাই তীব্র
ছিল যে পাথরের ঘরগুলো ধূলোয় পরিণত হয়েছিল। পাহাড় কঁপতে লাগল।
নগরবাসী চিংকার করলেও কেউ বাঁচেনি। তাদের অহংকার এবং তাদের
পাথরের ঘরগুলি নিমিষেই ধ্বংস হয়ে গেল।

শুধুমাত্র হজরত সালেহ (আ.) এবং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলেন
তারাই রক্ষা পেয়েছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিলেন।

সবকিছু শেষ হলে হযরত সালেহ ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। তার চোখে জল
এসে গেল। তিনি বললেনঃ

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর নাফরমানি করেছ। এটাই তোমাদের
পরিণাম।"

হজরত সালেহ (আ.)-এর ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহর নির্দশন
অঙ্গীকার করা খবৎস ডেকে আনে। অহংকার একজন মানুষকে অঙ্গ করে
দেয়। সামুদ জাতির পাথরের শহরটি আজ খালি - একটি নীরব সাক্ষ্য যে
স্টোরের শত্রুর কাছে কিছুই বেঁচে নেই।

পবিত্র কুরআন:  **তথ্যসূত্র:**

সূরা আরাফ (৭:৭৩-৭৯) ○

সূরা হৃদ (11:61-68) ○

সূরা আল-শামস (91:11-15) ○

জীবনী: ●

ইবনে কাথির, নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 90-95 ○

1. সামুদের অধিবাসীরা কোথায় তাদের ঘর নির্মাণ করেছিল?
2. হযরত সালেহ (রাঃ) মানুষকে কোন ইবাদত করতে নিষেধ
করেছিলেন?

3. আল্লাহতাআলা হযরতসালেহ(আ.)কে কোন নির্দর্শন দিয়েছেন?
 4. কারজন্য উটের দুধ যথেষ্ট?
 5. সামুদ্রে অধিবাসীরা উটের সাথে কি করেছিল?
 6. হযরতসালেহ(আ.) এবং কে বেঁচেছিলেন?
-

(6)

❖ হজরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বিশ্বাস- উদ্দীপক কাহিনী

বহু বছর আগে, একটি বড় শহরে একটি ছেলের জন্ম হয়েছিল এবং তার নাম ছিল ইব্রাহীম। বর্তমান ইরাকে অবস্থিত এই শহরটিকে "ব্যাবিলন" বলা হত। এটি একটি ব্যস্ত এবং সমৃক্ষ শহর ছিল, যেখানে লোকেরা বাজারে ব্যবসা করত, বড় বাড়িতে বাস করত এবং পাথরের মূর্তি পূজা করত। তিনি বলতেন:

"এরা আমাদের দেবতা, তারা আমাদের বৃষ্টি দেয়, ফসল ফলায় এবং আমাদের
রক্ষা করে!"

কিস্ত ইব্রাহীম (আঃ) শৈশব থেকেই চিন্তা করতেন:

"এই পাথরের মূর্তিগুলো কিভাবে আমাদের সাহায্য করবে? তারা কথা
বলতেও পারে না, নড়াচড়াও করতে পারে না!"

তারা আকাশের দিকে তাকায়, চাঁদ, সূর্য এবং তারার দিকে মনোযোগ দিয়ে
দেখে এবং ভাবে:

"এই সবকে করেছে?"

ইব্রাহীম (আঃ) বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র আল্লাহ আছেন যিনি সবকিছুর
স্রষ্টা।

 জাতির সাথে বিতর্ক

ইব্রাহীম (আঃ) যখন যুবক ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে কথা
বলেছিলেন। তারা মন্দিরে গেল যেখানে বিশাল মূর্তির সারি ছিল। তিনি
বললেনঃ

"তুমি এই পাথরের মূর্তিগুলোকে পূজা কর কেন? এরা শুনতে পায় না, কথা
বলে না, হাঁটতে পারে না!"

মানুষ রেগে গেল। তিনি বললেনঃ

"হে ইব্রাহীম! তুমি আমাদের দেবতাদের অপমান করছ। আমাদের পূর্বপুরুষরা
তাদের পূজা করত এবং আমরাও করি!"

ইব্রাহিম (আঃ) হেসে বললেনঃ

"এই মূর্তিগুলি কি আপনার কথা শোনে? তারা কি আপনার উপকার বা ক্ষতি
করতে পারে? তারা কেবল পাথর!"

মূর্তিপূজার ঘটনা

একদিন ইব্রাহিম একটা পরিকল্পনা করলেন। নগরবাসী বড় উৎসবে বের হলে
মন্দিরে প্রবেশ করত। তার হাতে একটি কুড়াল ছিল। তারা একে একে সব
ছোট মূর্তি ভেঙ্গে ফেলল, শুধু বড়টা রেখে দিল।
তারা বিশাল মূর্তির কাছে কুঠারটি রাখল।

লোকেরা ফিরে এসে মন্দিরের অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে যায়। তিনি বললেনঃ

"আমাদের দেবতা কে ভেঙ্গেছে? এটা ইব্রাহিম হতে পারতো!"

ইব্রাহিম (আঃ) কে ডাকা হল। তিনি বললেনঃ

"এই বড় মূর্তিটাকে জিজেস করো, তার কাছে কুঠার আছে!"

লোকেরা লজ্জিত হয়েছিল, কিন্তু ক্রোধে অব্রাহামকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত
নিয়েছিল।

ଓ নমরূদ ও আগ্নের ঘটনা

তৎকালীন বাদশাহ, যাকে ভাষ্যকারদের দ্বারা "নিমরোদ" বলা হত, নিজেকে
ঈশ্বর বলে অভিহিত করতেন। সে খুব গর্বিত ছিল।

নমরূদ ইব্রাহিমকে বললেন,

"তুমি আমার দেবতাদের অপমান করেছ, আমি তোমাকে আগ্নে পুড়িয়ে
দেব!"

নমরোদের লোকেরা বিশাল আগ্নের জ্বালিয়েছিল। এত বড় যে এর শিখা
আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

ইব্রাহিম (আঃ) কে দড়ি দিয়ে বেঁধে আগ্নে নিক্ষেপ করা হয়।

লোকেরা বলল:

"এটা পুড়িয়ে দাও এবং তোমার দেবতাদের সাহায্য কর!" (সূরা আম্বিয়া: ৬৮)

কিন্তু ইব্রাহিম (আঃ) চুপ থাকলেন। তারা আল্লাহর উপর ভরসা করেছিল।

আল্লাহ আগ্নের নির্দেশ দিয়েছেন:

"হে আগ্ন! আব্রাহামের কাছে শীতল ও শান্তিময় হও!" (সূরা আম্বিয়া: ৬৯)

ইব্রাহিম (আঃ) আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হননি, তিনি নিরাপদ ছিলেন।

মানুষ হতবাক। কেউ কেউ বিশ্বাস করলেও নমরুদ ও তার সঙ্গীরা অনড় ছিল।

তারা ইব্রাহিমকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিল।

শুভ মঙ্গায় হিজরত

অব্রাহাম তার স্ত্রী সারা এবং ভাতিজা লোটের সাথে শহর ছেড়ে চলে যান।

তিনি বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। একবার তিনি মিশরেও গিয়েছিলেন,

সেখানে তাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছিলেন।

পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন যে, ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী
হজরত হাজেরা ও পুত্র হজরত ইসমাইলকে মঙ্গার মরুভূমিতে রেখে যান।

তখন মঙ্গা ছিল জনশূন্য জায়গা—জল নেই, গাছ নেই, মানুষ নেই।

ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর হৃকুম অনুসরণ করে তাদের সেখানে রেখে যান।

হ্যরত হাজেরা সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে পানির সন্ধানে দৌড়াতে
থাকেন।

তারপর আল্লাহ একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটালেন - জমজমের বর্ণ ফেটে
গেল।

পানি বের হলো এবং হ্যারত হাজেরা ও হ্যারত ইসমাইল সেখানে বসতি স্থাপন
করলেন।

আজও মুসলমানরা এই মহান আত্মত্যাগকে স্মরণ করার জন্য হজের সময়
পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করে।

ত্যাগের মহা পরীক্ষা

অনেক বছর পর আল্লাহ ইব্রাহীমকে আরেকটি বড় পরীক্ষা দিলেন।

তিনি বললেনঃ

"হে ইব্রাহীম! তোমার প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে আমার পথে কোরবানি কর।"

ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর আদেশ মেনে নিলেন।

তিনি হ্যারত ইসমাইলকে বললেন,

"বাঢ়া! আল্লাহ আমাকে তোমাকে কোরবানি করার নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি কি
বলো?"

হজরত ইসমাইল (আ.) বলেন,

"হে পিতা! আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তাই করুন। ইনশাআল্লাহ আমি
ধৈর্যশীলদের একজন।" (সূরা আল-আসফাত: 102)

ইব্রাহিম ছুরি তুললেন, কিন্তু আল্লাহ একটি মেষ পাঠালেন।

আল্লাহ বলগেনঃ

"হে ইব্রাহিম! তুমি স্বপ্নকে সত্য করেছ। আমরা সৎকর্মশীলদের এভাবেই
পুরস্কৃত করি।" (সূরা আল-সিফাত: 105-107)

প্রতি বছর সৌদুল আয়হায় আমরা এই ঘটনার কথা স্মরণ করি।

কাবানির্মাণ

হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কাবা নির্মাণ।
তিনি হজরত ইসমাইল (আ.)-এর সঙ্গে মিলে মক্কায় কাবা নির্মাণ করেন।
তিনি প্রার্থনা করলেনঃ

"হে আল্লাহ! আমার প্রজন্মের মধ্যে একজন নবী পাঠান যিনি মানুষকে সত্যের
দিকে ডাকবেন।" (সূরা বাকারাঃ 129)

আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করেন এবং বহু শতাব্দী পরে হযরত মুহাম্মদ সা

হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে ‘খলিলুল্লাহ’ অর্থাৎ ‘আল্লাহর বন্ধু’ বলা হয়।
তার জীবন আমাদের সবচেয়ে কঠিন সময়েও আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে
শেখায়।

 কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| বিষয় | রেফারেন্স |
| একেশ্বরবাদ, প্রচেষ্টা কি? | সূরা আনামঃ ৭৪-৮৩ |
| আগ্নের ঘটনা | সূরা আম্বিয়াঃ ৫১-৭০ |
| ত্যাগের পরীক্ষা | সূরা আস-সিফাত: 99-113 |
| কাবা নির্মাণ হাদিস | সূরা আল-বাকারা: 124-132 |
| | সহীহ বুখারীঃ হাদিস নং ৩০৬ |

বিষয়

রেফারেন্স

জীবনী

ইবনে কাথির দ্বারা নবীদের গল্প: পৃষ্ঠা

105-120

1. ইব্রাহিমকোনশহরে জন্মগ্রহণ করেন?
 2. মূর্তি ভাঙার পর ইব্রাহিম কুড়াল কোথায় রেখেছিলেন?
 3. নিশ্চোদত্ত রাহামকে কী ছুঁড়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন?
 4. হাজেরাকেনসাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়েছিল?
 5. আল্লাহ তাআলা ইসমাইলের পরিবর্তে কী প্রেরণ করেছেন?
 6. হ্যরত ইব্রাহিম (আ.) কাকে নিয়ে কাবা নির্মাণ করেছিলেন?
-

(7)

❖ হজরতলৃত(আ.)-এরবিশ্বাস-উদ্দীপক কাহিনী

বহু বছর আগে সেখানে লৃত নামে এক নবী বাস করতেন। এই শহরের নাম ছিল সদোম। সদোম ছিল একটি সমৃদ্ধ শহর, যেখানে সবুজ মাঠ, বাগান এবং ঝুকঝাকে নদী ছিল। কিন্তু এই শহরের মানুষগুলো খুব খারাপ ছিল। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তারা চুরি করেছে, মিথ্যা বলছে এবং এমন কাজ করেছে যা আল্লাহ হারাম করেছেন। তারা রাস্তাধাটে লোকদের কষ্ট দিল এবং তাদের হৃদয় পাথরের মত কঢ়িন হয়ে গেল। তাই আল্লাহ তাদের কাছে লৃতকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

অনেক শাস্ত এবং সাহসী ছিল। তার মুখে এক ধরনের হাসি ছিল এবং তার কথায় সত্যতা ছিল। তিনি সদোমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন:

"তে আমার সম্প্রদায়! এই পাপ পরিত্যাগ কর। আল্লাহর আনুগত্য কর। তিনি তোমাদের এই শহর, এই ফসল, এই জীবন দিয়েছেন। তাঁর কাছে তওবা কর।"

কিন্তু শহরবাসী হেসেছিল। তাদের নেতারা বলেছেন:

"লোট, তুমি কি বলছ? আমরা আমাদের জীবন আমাদের খুশি মতোই বাঁচব।

তোমার সঁশ্বর আমাদের কিছুই করতে পারবেন না।"

লোকেরা লূতকে নিয়ে হাসাহাসি করত এবং তামাশা করত।

লট হতাশ হননি। তিনি খুব ধৈর্যশীল ছিলেন। তারা শহরের বাজারে

গিয়েছিলেন, যেখানে লোকেরা ফল এবং কাপড় বিক্রি করেছিল। তিনি রাস্তায়

দাঁড়িয়ে বললেন,

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছ। এই পাপ তোমাদের ধ্বংস

করবে। আল্লাহর কাছে ফিরে যাও, তিনি ক্ষমাশীল।"

কেউ কেউ তার কথা শুনল, কিন্তু অধিকাংশই তাকে অভিশাপ দিল। তিনি

বললেনঃ

"অনেক, তুমি আমাদের জীবন নষ্ট করতে চাও। চুপ কর!"

কিন্তু লট থামেননি। তিনি দিনরাত মানুষকে বুঝিয়েছেন।

একদিন আল্লাহ লুতের কাছে দুইজন ফেরেশতা পাঠালেন। তিনি মানব রূপে

এসেছেন। তারা সুন্দর ছিল এবং তাদের মুখে আলো ছিল। লুট তাদের দেখে

অবাক হলেন। সে তাদের তার বাড়িতে নিয়ে গেল।

কিন্তু শহরের দুষ্ট লোকেরা যখন এই দর্শনার্থীদের কথা শুনল, তখন তারা ভিড়

করে লোটের বাড়িতে উপস্থিত হল। তিনি বললেনঃ

"অনেক! আমাদের আপনার অতিথি দিন!"

লট বললেছেনঃ

"এমন করো না, এরা আমার মেহমান, আল্লাহকে ভয় করো!"

কিন্তু লোকজন হেসে দরজা ভাঙার চেষ্টা করল।

তখন ফেরেশতারা বললেনঃ

"হে লৃত! ভয় পেও না, আমরা আল্লাহর ফেরেশতা। এই শহরের মানুষ বাঁচবে

না। পরিবার নিয়ে এখান থেকে চলে যাও।"

লট অবাক হয়ে গেল। ফেরেশতারা বললেনঃ

"রাতে শহর ছেড়ে চলে যাও, পিছনে ফিরে তাকাও না, আল্লাহ এই শহরকে

ধ্বংস করে দেবেন।"

লৃত তার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে নিয়ে রাতের আঁধারে শহর ত্যাগ করেন। কিন্তু তার

স্ত্রী ছিল অবাধ্য। তিনি জনগণকে সমর্থন করেছিলেন, তাই তিনিও শাস্তিতে

যোগ দিয়েছিলেন।

সকালে আল্লাহর আযাব এল। আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি। সদোম শহরের
সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। বড় বড় বাড়ি, বাগান, সবকিছু মাটির নিচে চাপা
পড়ে গেছে। যারা লোটের কথা শোনেনি তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেল।
শুধুমাত্র লৃত এবং তার দুই কন্যা বেঁচে ছিলেন। আল্লাহ তাদের নিরাপদ স্থানে
নিয়ে গেলেন।

লট ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন। তার হাদয় ভারী হয়ে উঠল। তিনি বললেনঃ
"হে আল্লাহ! আমি আমার লোকদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা
তোমার কথা শোনেনি।"

হজরত লুত (আ.)-এর ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পাপ থেকে দূরে থাকা
জরুরি। আল্লাহর আনুগত্যাই মুক্তির একমাত্র পথ। সদোমের ধ্বংসাবশেষ
আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের শান্তি থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না।

সঠিক তথ্যসূত্র (রেফারেন্স):

পবিত্র কুরআন:

সূরা হুদ, আয়াত 77-83 •

সূরা আল-আরাফ, আয়াত 80-84 •

সূরা আল-নামল, আয়াত 54-58 •

সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত 28-35 •

হাদিস:

সহীহ বুখারী, হাদিস নং 4720 (নবীগণের কাহিনীতে হ্যরত লুতের •

উল্লেখ)

জীবনী ও ভাষ্যঃ

ইবনে কাথির, আল-বাদায়াহ ওয়াল-নাহিয়াহ বা নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা •

125-130 (সদোমের ধ্বংস এবং হ্যরত লুতের হিজরত বর্ণনা

করে)

- নবীলোত (সা.) কোন শহরে প্রেরণ করেন?
- ঈশ্বর যানিষেধ করেছিলেন, তাসদোমের লোকেরাকীভাবে
করেছিল?
- হ্যরত লোত (রাঃ) এর বাড়িতে অতিথি হিসেবে কে
এসেছিলেন?

- হ্যৱতলোত (আ.) তাঁৰ উম্মদদেৱকী উপদেশ দিয়েছিলেন?
 - লৃত (আ.) এৱজীবিত ব্যক্তিৱাকাৱা?
 - হ্যৱতলোত (সা.) এৱন্তীকে কেন শাস্তিৱ অভুত্তক কৱাহলো?
-

হজরত ইসমাইল (আ.) (৮)

বহু বছর আগে মঙ্কার মরুভূমিতে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। এই গল্পের নায়ক ছিলেন ইব্রাহিমের ছেলে ইসমাইল। হজরত ইসমাইল (আ.)-এর জন্ম ছিল অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তার বাবা ইব্রাহিম এবং তার মা বহু বছর ধরে একটি সন্তানের জন্য প্রার্থনা করছিলেন। ইসমাইল (আ.) যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ! ধন্যবাদ, আপনি আমার দোয়া করুন করেছেন। কিন্তু ঈশ্বর ইব্রাহিমকে এক মহা পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বললেনঃ হে ইব্রাহিম! তোমার স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাইলকে মঙ্কার মরুভূমিতে রেখে যাও। মঙ্কা ছিল খালি জায়গা। গাছ ছিল না, জল ছিল না, মানুষ ছিল না। সেখানে শুধু বালি আর পাথর ছিল। ইব্রাহিমের মন ভারী হয়ে গেল কিন্তু তিনি আল্লাহর আনুগত্য করলেন। তিনি তার স্ত্রী হাজেরা এবং শিশু ইসমাইলকে মঙ্কায় নিয়ে যান। একটা পাহাড়ের ধারে তাদের ফেলে রেখে গেল। হাজেরা আশচর্য হয়ে বললেন: "ইব্রাহিম! তুমি কি আমাদের এখানে রেখে যাচ্ছ?"

হজরত ইব্রাহিম (আ.) বললেন, হ্যাঁ, এটাই আল্লাহর নির্দেশ। হাজেরা আল্লাহর

উপর ভরসা করেছিলেন। তিনি বললেন: "ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করবেন।"

হাজেরা ও ইসমাইল মরুভূমিতে একা ছিলেন। হজরত ইসমাইল (আ.) তখন

খুবই ছোট এবং বয়স মাত্র কয়েক মাস। তারা ক্ষুধার্ত বলে কানাকাটি শুরু করে। তাদের পানি ছিল না। হাজেরা পানির সন্ধানে ছুটে গেল। তিনি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং চারদিকে তাকালেন। কিছুই পাওয়া যায়নি। সে মারওয়াহ পাহাড়ের দিকে ছুটে গেল। এখনও কিছু পাওয়া যায়নি। তিনি সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাতবার দৌড়ালেন। হঠাৎ তারা দেখলেন যে, হজরত ইসমাইলের পা দিয়ে পানি বের হচ্ছে। এটি ছিল জমজমের কৃপ যা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অলোকিক উপহার। তারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল: "জমজম! জল!" তিনি হজরত ইসমাইল (আ.)-কে পানি দেন। আজও মুসলমানরা হজের সময় জমজমের পানি পান করে সাফা ও মারওয়ার দিকে ছুটে যায় এবং হাজেরাকে স্মরণ করে।

ইসমাইল যখন বড় হলেন, তখন তিনি একজন সাহসী ও শক্তিশালী ছেলে হয়ে উঠলেন। তিনি মা হাজেরার সাথে মঙ্কায় থাকতেন। একদিন হজরত ইব্রাহিম মঙ্কায় ফিরে আসেন। তিনি হজরত ইসমাইল (আ.)-কে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু ঈশ্বর ইব্রাহিমকে আরেকটি বড় পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বললেনঃ হে ইব্রাহিম! তোমার প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কুরবানী কর। হজরত ইব্রাহিম (আ.)-

এর হৃদয় ভেঙে গেল। হজরত ইসমাইল (আ.) ছিলেন তাঁর চোখের জ্যোতি।

তিনি হজরত ইসমাইল (আ.)-কে বললেন, "হে পুত্র! আল্লাহর আমাকে এ আদেশ দিয়েছেন, তুমি কি বল?" হ্যরত ইসমাইল অত্যন্ত সাহসী ছিলেন।

তিনি হেসে বললেন: "বাবা! ঈশ্বর যা বলেন তাই করুন। আমি প্রস্তুত।"

হজরত ইব্রাহিম (আ.) হজরত ইসমাইল (আ.)-কে একটি পাহাড়ে নিয়ে যান।

সে একটা ছুরি তুলে নিল। হ্যরত ইসমাইল চুপচাপ শুয়ে পড়লেন। তখন

ঈশ্বর একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা বললেনঃ হে ইব্রাহিম!

অপেক্ষা কর! তুমি আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। ঈশ্বর একটি মেষ পাঠান।

ফেরেশতা বললেন: "এই মেষটি বলি দাও।" হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও হজরত ইসমাইল (আ.) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তারা একটি মেষ বলি দিল।

ঈদুল আজহার এই ঘটনাটি আমাদের মনে পড়ে।

হজরত ইসমাইল (আ.) যখন বড় হন, তখন তিনি তাঁর পিতা হজরত ইব্রাহিম

(আ.)-এর সঙ্গে কাবা নির্মাণ করেন। কাবা ছিল আল্লাহর ঘর যেখানে মানুষ

ইবাদত করতে আসত। তারা পাথর সংগ্রহ করে, দেয়াল তুলে দোয়া করে:

"হে আল্লাহ! আমাদের আমল কবুল করুন।" হ্যরত ইসমাইল ছিলেন একজন পরিশ্রমী। তাদের ছিল পাথর এবং হ্যরত ইব্রাহিম দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন।

যখন কাবা নির্মিত হয়েছিল, তখন তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছিল।

আজও মুসলমানরা হজে কাবা প্রদক্ষিণ করে হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও হজরত

ইসমাইল (আ.)-কে স্মরণ করে।

হজরত ইসমাইল (আ.)-এর গল্প আমাদের কঠিন সময়েও আল্লাহর আনুগত্য
করতে শেখায়। তারা সাহসী ছিল এবং ঈশ্বরের উপর ভরসা করেছিল।
জমজমের কৃপ এবং কাবা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আল্লাহ কখনো তাঁর
বান্দাদের ভুলে যান না।

ইঙ্গিত (সঠিক উল্লেখ):

পরিত্র কুরআন: •

সূরা আল-বাকারা, আয়াত 124-129 ০

সূরা আল-সাফাত, আয়াত 99-113 ০

হাদিস: •

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৪ ০

জীবনী: •

ইবনে কাসির রহ নবীদের গল্প, পৃ. 135-140 ০

1. ইসমাইলকে মরুভূমিতে কোন শহরে রেখে দেওয়া হয়েছিল?
 2. হাজেরা পানির সঞ্চানে দুই পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ে গেলেন?
 3. জমজমের পানি কোথায় থেকে এলো?
 4. কাকে ইব্রাহীম (আঃ) কে কোরবানি করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল?
 5. আল্লাহ তাআলা ইসমাইলের পরিবর্তে কী প্রেরণ করেছেন?
 6. ইসমাইল (আঃ) তার পিতার সাথে কি নির্মাণ করেছিলেন?
-

(9)

হজরত ইসহাক (আ.)

বহু বছর আগে, কেনান নামক একটি সুন্দর দেশে, ইসহাক নামে একজন
ভাববাদী বাস করতেন। তিনি ছিলেন হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর পুত্র।
আব্রাহাম এবং তার স্ত্রী সারা বহু বছর ধরে একটি সন্তানের জন্য প্রার্থনা
করছিলেন। তারা বুড়ো হয়ে গিয়েছিল এবং সারা ভেবেছিল তার আর কখনো
সন্তান হবে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের দোয়া কর্বুল করলেন। ফেরেশতা এসে
হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে বললেন, সারার একটি পুত্র সন্তান হতে চলেছে।
তার নাম রাখা হয়েছিল আইজ্যাক, যার অর্থ "হাসি", কারণ তার জন্ম সবাইকে
খুশি করেছিল।

আইজ্যাক খুব শান্ত এবং ভালো ছেলে ছিল। তার মুখে মৃদু হাসি ছিল এবং তার
হাদয় ঈশ্বরের প্রেমে পূর্ণ ছিল। তিনি তার পিতা ইব্রাহিমের কাছ থেকে ঈশ্বর
সম্বন্ধে শিখেছিলেন। ইব্রাহিম (আঃ) তাকে বলতেন: "হে ইসহাক! সর্বদা
আল্লাহর উপর ভরসা কর। তিনি কখনো আমাদের একা ছেড়ে দেন না।"

ইসহাক তার বাবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তারা গাছের ছায়ায় বসে
দোয়া করতেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।

ইসহাক যখন বড় হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর পিতার মতো একজন নবী
হয়েছিলেন। ঈশ্বর তাকে মানুষের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি
কেনানের লোকদের কাছে যেতেন এবং বলতেন: "হে আমার সম্প্রদায়!
একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি তোমাদের সবকিছু দিয়েছেন: এই ফসল,
এই পানি, এই জীবন।" লোকেরা ইসহাকের কথা শুনেছিল কারণ তার কথা
সত্য শক্তিশালী ছিল। তিনি খুব দয়ালু ছিলেন। তিনি গরীবদের খাবার দিতেন,
অসুস্থদের দেখতে যেতেন এবং শিশুদের সাথে হাসতেন এবং খেলতেন।
আইজ্যাকের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল তার বিয়ে। আব্রাহাম
আইজ্যাকের জন্য একটি ভাল মেয়ে চেয়েছিলেন। তিনি তার বিশ্বস্ত দাসকে
একটি দূর দেশে পাঠিয়েছিলেন, যেখানে তার আত্মীয়রা বাস করতেন।
আল্লাহর হৃকুমে খাদিম রেবেকা নামে একটি মেয়ে পেল। রেবেকা দয়ালু এবং
সুন্দর ছিল। তিনি ইসহাকের প্রী হন। আইজ্যাক এবং রেবেকা সুখে একসাথে
থাকতেন। দুজনেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন।
কিন্তু ইসহাক ও রেবেকারও একটা পরীক্ষা ছিল। দীর্ঘদিন তাদের কোনো
সন্তান হয়নি। তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল। ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা উত্তর.

রেবেকার দুটি পুত্র ছিল: যাকোব এবং এয়ো। ইসহাক তার ছেলেদের খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে চলতে শিখিয়েছেন। তারা বলত: "জ্যাকব, এসাউ! সর্বদা সত্য কথা বল। আল্লাহ সত্যবাদীদের ভালবাসেন।"

আইজ্যাকের জীবন ছিল শান্তিপূর্ণ এবং ঈশ্বরের উপাসনায় পূর্ণ। তারা কেনানের ক্ষেত্রে ভেড়া ও ফসল তুলত এবং মানুষকে আল্লাহর পথ দেখাত। তিনি ধৈর্যশীল ছিলেন। একসময় তাদের শক্ররা তাদের কুয়া বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ইসহাক রাগ করলেন না। তারা একটি নতুন কৃপ খনন করেছিল এবং ঈশ্বরের উপর ভরসা করেছিল। ঈশ্বর তাদের আরও জল দিয়েছেন। লোকেরা তার ধৈর্য দেখে অবাক হয়েছিল।

ইসহাক যখন বৃক্ষ হলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্র জ্যাকবকে আশীর্বাদ করলেন। তিনি বললেনঃ হে ইয়াকুব! তুমি আমার পরে নবী হবে। মানুষকে আল্লাহর পথে দাও। আইজ্যাকের গল্প আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শেখায়। তিনি দয়ালু, ধৈর্যশীল এবং সত্য ছিলেন। তাঁর জীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আল্লাহ কখনও তাঁর বান্দাদের প্রার্থনা ফিরিয়ে দেন না।

 ইঙ্গিত (সঠিক উচ্চেখ):

কোরান: •

সূরা হুদ, আয়াত 69-73 ০

সূরা আল-সাফাত, আয়াত 112-113 ০

হাদিস: •

(সহীহ মুসলিমে হজরত ইসহাক (আ.)-এর উল্লেখ আছে, ০

তবে হাদিস নং 2374-এর নিশ্চয়তা আবশ্যিক।)

জীবনী: •

ইবনে কাসির রহ নবীদের গল্প, পৃ. 145-150 ০

1. ইসহাকের বাবার নাম কি?
2. ইসহাকের মায়ের নাম কি?
3. ইসহাকের স্ত্রীর নাম কি?
4. ইসহাকের কতজন পুত্র ছিল?
5. ইস্থাক কনানে কী করেছিলেন?

6. হ্যারত ইসহাক (আ.) তাঁর পরেনবী হওয়ার জন্য কারজন্য

দোয়া করেছিলেন?

(10)

হজরত ইয়াকুব(আ.)

বহু বছর আগে কেনান দেশে ইয়াকুব নামে এক নবী বাস করতেন। তিনি ছিলেন হজরত ইসহাকের পুত্র এবং হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর নাতি। জ্যাকব খুব জ্ঞানী এবং ধৈর্যশীল ছিলেন। তার মুখে একটি শান্ত হাসি ছিল, এবং তার হৃদয় সৌন্দর্যের প্রেমে পূর্ণ ছিল। লোকেরা তাকে "ইস্রায়েল" বলে ডাকত যার অর্থ "আল্লাহর দাস"। তিনি তার জীবনে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু সর্বদা সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করেছিলেন।

জ্যাকব যখন শিশু ছিলেন, তখন তিনি তাঁর পিতা আইজ্যাকের কাছ থেকে সৌন্দর্য সম্বন্ধে শিখেছিলেন। তিনি তার বড় ভাই এয়োর সাথে খেলতেন।

Esau শক্তিশালী এবং শিকারী ছিল, কিন্তু জ্যাকব শান্ত এবং জ্ঞানী ছিল। যখন ইসহাক বৃন্দ হলেন, তিনি জ্যাকবকে আশীর্বাদ করলেন। তিনি বললেনঃ হে ইয়াকুব! তুমি আমার পরে নবী হবে। মানুষকে আল্লাহর পথে দাও। এই আশীর্বাদের পর ইয়াকুবের জীবনে অনেক পরীক্ষা শুরু হয়। এয়োরেগে

গিয়েছিলেন এবং জ্যাকবের ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। তাই জ্যাকবকে তার
মা রেবেকা এক দূর দেশে যেতে বলেছিলেন।

ইয়াকুব ফাদান আরাম নামক এলাকায় তার মামার বাড়িতে যান। সেখানে তিনি
তার চাচা লাবনের মেয়ে রাহেলকে দেখতে পেলেন। রাহেল সুন্দর এবং দয়ালু
ছিল। জ্যাকব তাকে ভালবাসত। তিনি লাবনকে বললেন: "আমি সাত বছর
কাজ করব, তাই আমাকে রাহেলের সাথে বিয়ে দাও।" জ্যাকব সাত বছর
ভেড়া চরালেন, কিন্তু লাবন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। তিনি
রাহেলের পরিবর্তে জ্যাকবের সাথে তার বড় মেয়ে লেয়াকে বিয়ে
করেছিলেন। জ্যাকব আরও সাত বছর কাজ করেছিলেন এবং রাহেলকে বিয়ে
করেছিলেন। তিনি খুব ধৈর্যশীল ছিলেন। দীর্ঘ তাকে বারোটি পুত্র
দিয়েছিলেন, যারা পরে ইশ্রায়েলের বারোটি গোত্রের প্রধান হয়েছিলেন।

ইয়াকুবের জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ছিল তার ছেলে ইউসুফের ক্ষেত্রে।
জোসেফ ছিলেন জ্যাকবের প্রিয় পুত্র। তিনি ইউসুফকে খুব ভালোবাসতেন।
কিন্তু ইউসুফের ভাইয়েরা তাকে ঈর্ষাঞ্চিত করেছিল। তারা যোসেফকে একটি
গর্তে নিষ্কেপ করে এবং জ্যাকবকে জানায় যে সিংহটি ইউসুফকে খেয়ে
ফেলেছে। তিনি বললেন: "আমার কাছে ইউসুফ নেই! আমার হৃদয় ভেঙে
গেছে!" তিনি বছরের পর বছর কাঁদলেন, কিন্তু দীর্ঘের প্রতি বিশ্বাস হারাননি।

তারা দোয়া করল: "হে আল্লাহ! আমাকে ইউসুফকে ফিরিয়ে দাও।"

জ্যাকব কেনানে ফিরে গেলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে
ডাকতেন। তিনি বলতেন: "হে আমার সম্প্রদায়! একমাত্র আল্লাহর ইবাদত
কর, তিনি তোমাদের রক্ষা করবেন।" তিনি জগনী ও দয়ালু ছিলেন বলে
লোকেরা তাঁর কথা শুনত। বহু বছর পর, ঈশ্বর ইয়াকুবের প্রার্থনা করুণ
করলেন। জোসেফ বেঁচে ছিলেন। তিনি মিশরের একজন সিনিয়র মন্ত্রী
হয়েছিলেন। জ্যাকব এবং ইউসুফ পুনরায় মিলিত হয়। ইয়াকুব আনন্দে
কাঁদতে লাগলো। তিনি বললেন: "হে আল্লাহ! ধন্যবাদ, আপনি আমার
ইউসুফকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

জ্যাকবের গন্ধ আমাদের ধৈর্য ধরতে শেখায়। আপনি যখন ঈশ্বরকে বিশ্বাস
করেন, তিনি সবকিছু ঠিক করে দেবেন। জ্যাকবের জীবন পরীক্ষায় পূর্ণ ছিল,
কিন্তু তিনি কখনো হাল ছেড়ে দেননি। তার বারোজন ছেলে ইসরাইল গোত্রের
ভিত্তি হয়ে ওঠে।

ইঙ্গিত (সঠিক উল্লেখ):

পরিত্র কুরআন: •

সূরা ইউসুফ, আয়াত 4-18 ○

সূরা আল-বাকারা, আয়াত 132-133 ।

জীবনী: •

ইবনে কাসির রহ নবীদের গল্প, পৃ. 155-160 ।

1. ইয়াকুবের পিতা ও দাদার নাম কি?
2. হ্যরত ইয়াকুব (আ.) কে লোকেরা কোন নামে ডাকে?
3. হ্যরত ইয়াকুব সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়াসাল্লাম কাকে বিয়ে করার জন্য সাত বছর কাজ করেছিলেন?
4. ইয়াকুবের কতজন পুত্র ছিল?
5. হ্যরত ইয়াকুব (আ.) এর কোন পুত্রকে গর্তে ফেলে দেওয়া হয়?
6. হ্যরত ইয়াকুব (আ.) তাঁর উম্মদদের কি উপদেশ দিয়েছিলেন?

(11)

✿ হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এর অলৌকিক কাহিনী

বহু বছর আগে, কেনান নামক একটি অঞ্চলে, একটি সুন্দর এবং গুণী ছেলের জন্ম হয়েছিল ইউসুফ সেই হ্যরতকে রাখলেন ইয়াকুব (আঃ)। তার একটি ছেলে ছিল। ইউসুফ ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন, জনী ও বিশুদ্ধ প্রকৃতির। তাঁর মুখমণ্ডল এতটাই উজ্জ্বল ছিল যে দর্শকরা বিস্মিত হয়েছিলেন। হজরত ইয়াকুব (আ.)-এর ইউসুফের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা ছিল এবং তিনি ইউসুফকে একটি দান করেছিলেন বিশেষ শার্ট দিয়েছেন, যা তার ভাইদের উর্ধ্বান্বিত করেছে।

ইউসুফ (আঃ) একদিন স্বপ্ন দেখলেন এগারোটি তারা, সূর্য ও চাঁদ তাদের সাজদাহ এ স্বপ্ন তিনি তাঁর পিতা হ্যরত ইয়াকুব (আঃ)-কে বর্ণনা করলেন। ইয়াকুব (আঃ) বললেন: "হে বৎস! এই স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড়

নিদর্শন। আল্লাহ তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। কিন্তু এই স্বপ্ন তোমার
ভাইদের বলবেন না, তারা পর্যাপ্তি হবে।"

ইউসুফের ভাইয়েরা আগে থেকেই উর্ধ্বাস্থিত ছিল। তারা বলত: "বাবা
ইউসুফের এত প্রিয় কেন? আমরা তার চেয়ে বড়!" একদিন সে খারাপ
পরিকল্পনা তিনি ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে গেলেন গভীর কূপ ছুড়ে দিলাম।
ইউসুফ চিৎকার করে বললেন: "হে ভাই! আমাকে বাঁচাও!" কিন্তু সে তারা
হাসতে লাগল। তিনি ইউসুফ রাশাটে নকল রাস্ত তিনি তা হয়রত ইয়াকুবকে
দেখিয়ে বললেনঃ ইউসুফকে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে! ইয়াকুব (আঃ) দুঃখে
বললেনঃ আমার ইউসুফের কি হয়েছে?

কিছুক্ষণ পর একটা কাফেলা সেখান দিয়ে চলে গেল। তারা ইউসুফকে কূপ
থেকে টেনে বের করে আনল এবং মিশর যেখানে নিয়ে গেলেন ইউসুফ দাস
তৈরি এবং বিক্রি। ইউসুফের কাছে প্রিয় মিশর ঘরে রাখা হয়েছে। ইউসুফ খুব
সৎ, পরিচ্ছন্ন এবং পরিশ্রমী আজিজ তাদের আদর করতে লাগল। কিন্তু
ইউসুফের ওপর আজিজের স্ত্রী একটি মন্তব্য করুন ডালি। জোসেফ
বলেছেনঃ টৈশর আশীর্বাদ করুন! আমি এমন পাপ করতে পারিনা।" এ প্রসঙ্গে
আজিজের স্ত্রী মো মিথ্যা অভিযোগ রাখা, এবং ইউসুফ কারাবাস সম্পর্ক

কারাগারে ইউসুফ দৈর্ঘ্য আর কি আল্লাহর ইবাদত আমি ব্যস্ত ছিলাম। বন্দীদের
মধ্যে যারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা একদিন বলত মিশরের রাজারা একটি অঙ্গুত স্বপ্ন

দেখেছেন, যা কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেনি। এরপর কারাগার থেকে
ইউসুফকে ডাকা হয়। তিনি বললেনঃ হে মহারাজ! আপনার স্বপ্নের তাৎপর্য
হলো শনি বছর শুভ মৌসুম তাহলে হবে সাত বছরের দুর্ভিক্ষ আসবে তোমার
এখন উচিত শস্য সংগ্রহ কর।"

ইউসুফের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় রাজা বিস্মিত হলেন মিশরের মন্ত্রী নিযুক্ত দুর্ভিক্ষের
দিনে জোসেফ শস্য বিতরণ আর কি গরীবদের সাহায্য করুন এর

অপরদিকে কেনানে হযরত ইয়াকুব (আ.) ও তার ছেলেরা ক্ষুধা নিয়ে চিন্তিত
ইউসুফ ভাই ছিলেন মিশর শস্য নিতে তিনি ইউসুফের কাছে আসেন চিন্তে
পারেনি। ইউসুফ তার পরীক্ষা নিলেন, এবং অবশেষে বললেনঃ আমি যোসেফ,
আর ইনি আমার ভাই বেঞ্চামিন।" ভাইরা লজ্জিত হয়ে বললেন, "আমাদের
কাছে ইউসুফ আমাকে ক্ষমা করো। ইউসুফ ড হাসি তিনি বললেনঃ আজ
তোমার উপর কোন দোষ নেই, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন এবং আমিও
তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

ইউসুফ তার পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও পরিবারের সকলের কাছে যাকে
বলে মিশর যখন ইয়াকুব ও ইউসুফ আ আবার দেখা তাই ইয়াকুব (আ.)
আনন্দে কেঁদে ফেলল।

॥ পূর্ববর্তী

আমাদের কাছে হজরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবন ধৈর্য, পবিত্রতা, ক্ষমা এবং
আল্লাহর উপর ভরসা প্রতিটি পরীক্ষায় শেখায় স্থির পা থেকে যান, এবং আল্লাহ
তাদের দিয়েছেন সম্মান, জ্ঞান এবং শক্তি তিনি মঙ্গুর করেছেন এই গল্পটি
আমাদের মনে করিয়ে দেয় আল্লাহ কখনো ভালো মানুষকে নষ্ট করেন না।

■ তথ্যসূত্র

কোরান: সূরা ইউসুফ (আয়াত 1-101) •

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৮৬ •

জীবনী: ইবনে কাথির, নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 165-180 •

1. হ্যরত ইউসুফ (আ.) স্বপ্নে কী দেখেছিলেন?
2. তার ভাইয়েরা যোষেফকে কোথায় ফেলে দিয়েছিল?
3. হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) কেন ইউসুফের প্রতি বিশেষ ভালবাসা ছিল?

4. মিশরের রাজার স্বপ্ন কী ছিল?
 5. কেন জোসেফকে কারাগারে যেতে হলো?
 6. অবশেষে, নবী ইউসুফ তার ভাইদের কী বলেছিলেন?
-

(12)

♣ হজরত শোয়াইবের পরামর্শ ও মাদিয়ান ধর্ম

অনেক বছর আগের কথা গোত্রগুলোকে মিদিয়ান বলা হয় আমি একজন নবী
নামে বসবাস করতাম হজরত শোয়াইব (আ.)। মিদিয়ান ছিল একটি ব্যস্ত
এলাকা যেখানে লোকেরা ব্যবসা করত, বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করত এবং সম্পদ
জমা করত। কিন্তু এ জাতির মানুষ বিশ্বাসহীন করা হয়েছিল সে বাণিজ্যে
প্রতারণা দেওয়া, ওজন হ্রাস করছেন, অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ গ্রহণ এবং
গরিবদের ক্ষতি তাদের বিতরণ সে আল্লাহকে ভুলে গেছে ছিল এবং শিরক
আমি পীড়িত ছিল।

হজরত শোয়াইব (আ.)। বুদ্ধিমান, সাহসী এবং দয়ালু তার কথায় সত্য এবং

চোখে আলো ছিল। তিনি মাদিয়ানের বাজারে দাঁড়িয়ে বলবেন:

"হে আমার সম্প্রদায়! এই প্রতারণা পরিত্যাগ কর। সৎভাবে ব্যবসা কর।

আল্লাহর আনুগত্য কর, যিনি তোমাদেরকে সম্পদ ও জীবন দিয়েছেন।"

কিন্তু জাতির প্রধান এবং ধনী মানুষ তাদের দেখে হাসুন। তারা বলে:

"হে শোয়েব! তুমি কি বলছ? এটাই আমাদের পথ। তোমার প্রভু আমাদের
কিছুই করতে পারবেন না!"

হজরত শোয়াইব (আ.)। হতাশ হবেন না. সে ধৈর্য মানুষকে বোঝাতে থাকুন।

তিনি রাস্তায়, বাজারে এবং বাড়িতে গিয়ে বলতেন:

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা পথপ্রস্ত হয়ে যাচ্ছ। প্রতারণা ও পাপ তোমাদের

ধ্বংস করবে। আল্লাহর কাছে তওবা কর, তিনি ক্ষমাশীল।"

কিছু দরিদ্র মানুষ ও শিশুরা তাদের কথা শুনে তারা বিশ্বাস করল। তারা বলে:

"হে হ্যরত শোয়াইব! আমরা তোমার আনুগত্য করব।"

কিন্তু ধনীরা রাগান্বিত এসে বললেনঃ

"ও শোয়েব! তুমি আমাদের ব্যবসা ধ্বংস করতে চাও। আমাদের শহর থেকে

বের হয়ে যাও!"

হ্যরত শোয়াইব (আঃ) বললেনঃ

"আমি তোমার কাছে কোনো ক্ষতিপূরণ চাই না। আমি শুধু আল্লাহর বার্তা
পৌঁছে দিচ্ছি। তুমি আমাকে যত খুশি ভয় দেখাও, আমি থামব না।"

মাদিয়ানবাসী একগুঁয়ে সম্পন্ন তারা প্রতারণা করতে থাকে, গরীবদের কষ্ট
দিতে থাকে এবং হ্যরত শোয়াইবের কথায় হাসছে. তারা বলে:

"শোয়েব শুধু হ্মকি দেয়। আমাদের কিছুই হবেনা!"

কিন্তু একদিন সবকিছু বদলে গেল. আকাশে মেঘে ঢাকা. বায়ুমন্ডলে এটা
অঙ্গুত দম বন্ধ ছিল আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হ্যরত শোয়াইব (রাঃ)
বললেনঃ

"এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা। এখনো সময় আছে, তওবা কর!"

কিন্তু মানুষ ঠাট্টা করতে থাকুন. তিনি বললেনঃ

"এটা গরম, আমরা এর চেয়ে বেশি দেখেছি!"

তারপর হঠাতে একজন ভয়ংকর দিন এটা কি আকাশ পণ্য একটি সম্পন্ন একটি
শক্তিশালী ভূমিকম্প এটা কি পৃথিবী কাঁপতে লাগল. মাদিয়ানের বাড়ি ধুলায়
পরিণত হয়েছে. তাদের সব ধর্ম হয়েছে যারা হজরত শুয়াইব (আ.)-এর
কথা শোনেনি। তাদের মাটিতে চাপা আর্তনাদ চলে গেছে।

শুধু হ্যরত শোয়াইব (আ.) এবং যারা রাখাল আল্লাহর আনুগত্য অভ্যন্তর নিরাপদ
থাক আল্লাহ তাদের দিয়েছেন শান্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে।

হজরত শোয়াইব (আঃ) বললেনঃ

"হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের বুঝিয়েছি, কিন্তু তোমরা আল্লাহর কথা
শোননি।"

﴿ ﴿ পূর্ববর্তী

হজরত শোয়াইব (আ.)-এর ঘটনা। সততা, ধৈর্য, সত্যবাদিতা এবং আল্লাহর
উপর ভরসা এই গল্পটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রতারণা, নিপীড়ন ও শিরক
মানুষ ধর্ম, এবং আল্লাহ ভালো মানুষদের হেফাজত করুন বলেন

তথ্যসূত্র

পরিব্রাজকুরআন: সূরা হৃদ (আয়াত 84-95) •

পরিব্রাজকুরআন: সূরা আরাফ (আয়াত 85-93) •

হাদিস: সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৮৭৭ •

জীবনী: ইবনে কাথির, নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 185-190 •

1. হ্যারত শুয়েব (আ.) কোন জাতির নবী ছিলেন?
 2. মিদিয়নের লোকেরা বাণিজ্য কী ভুল করেছিল?
 3. হ্যারত শ'আইব (আ.) তাঁর উন্নতকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?
 4. হ্যারত শোয়েব (রাঃ) এর কথা কে শুনেছেন?
 5. মিদিয়নের লোকদের উপর কী ধরনের শাস্তি হয়েছিল?
 6. হ্যারত শুয়েব (রাঃ) শাস্তির পূর্বে তাঁর সম্প্রদায়কে কী বলেছিলেন?
-

(13)



হজরত মুসা (আ.)-এর অলৌকিক জীবন

অনেক বছর আগের কথা মিশর নামক দেশে একজন নবীর জন্ম হয়েছিল

হজরত মুসা (আ.)। তখন মিশরে ছিল ফেরাউন নামি নামে এক রাজা শাসন করতেন, যিনি খুব নিষ্ঠুর এবং স্ব-ধার্মিক তিনি ছিলেন বনী ইসরাইল তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে দাস তাদের তৈরি করেছেন এবং তাদের কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

একদিন ফেরাউন খবর পেল যে, একজন ইসরাইল একটি ছেলের জন্ম হবে এতে তার সাম্রাজ্যের অবসান ঘটবে। ফেরাউন ভীত এটি করা হয়েছিল এবং ইন্দ্রায়েলের সন্তানদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল সব নবজাতক ছেলেদের হত্যা করুন করা উচিত

হজরত মুসার মাতা রা উদ্বিগ্ন তখন আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে প্রকাশ করলেন যে, মুসা আ ঝুড়িতে নীল নদ এটা আমার উপর ছেড়ে দিন, আমরা এটি রক্ষা করব। কাঁদতে থাকা মুসাকে তারা একটা ঝুড়িতে ভরে নদীতে ফেলে দিল। হযরত মুসা আ বোন দূর থেকে ঘুড়ি দেখতে থাকুন।

ବୁଡ଼ି ଫେରାଉନେର ପ୍ରାସାଦ କାହେ ଏସେଛେ । ଫେରାଉନେର ଶ୍ରୀ ଆସିଯା ବୁଡ଼ି ଦେଖେ
ମୁସାକେ ଦେଖିତେ ପେଲ । ତିନି ମୂସା ଆ ହାସି ଦେଖେଛି ଏବଂ ପ୍ରେମେ ପଡ଼େଛି । ତିନି

ଫେରାଉନକେ ବଲଲେନ,

"ଏହି ଶିଶୁଟି ଆମାଦେର ଚୋଥେର ମଣି, ତାକେ ମାରବେନ ନା ।"

ଫେରାଉନ ଅନୁମତି ଦିଲେନ ଏବଂ ହସରତ ମୁସାଓ ଅନୁମତି ଦିଲେନ ଫେରାଉନେର
ପ୍ରାସାଦ ତୁଳଲେନ ଆମି ଘଟେଛେ.

ହଜରତ ମୁସା ଯଥନ ବଡ଼ ହଲେନ, ତିନି ଆ ଶତିଶାଲୀ, ଜାନୀ ଏବଂ ଗୁଣୀ ତାରା
ଇନ୍ଦ୍ରାୟଲେର ସନ୍ତାନଦେର ଉପର ହବେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଦେଖିଲାମ ଏକଦିନ ଓରା ଯେ ଦେଖିଲ
ମିଶରୀୟ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରାୟଲୀୟରା ହଜରତ ମୁସାକେ ହତ୍ୟା କରେ ନିର୍ଯ୍ୟାତିତଦେର ବାଁଚାନୋର
ଚେଷ୍ଟା କରେନ ଭୁଲବଶତ ଏକଜନ ମିଶରୀୟକେ ହତ୍ୟା କରା ଏଟା କରେଛେ
ଏ ଖବର ଫେରାଉନେର କାହେ ପୋଁଛାଲେ ତିନି ହଜରତ ମୁସା ଆ ଗ୍ରେଫତାର ଏଟା
କରତେ ପୁରୁଷଦେର ପାଠାନ । ହଜରତ ମୁସା ଆ ମିଶର ଛେଡେଛେ ଏବଂ ମିଦିଆନ
ଗିଯେଛିଲାମ

ମାଦିଆନେ ହଜରତ ମୁସା ଆ କୃପ କାହେ ବିଶ୍ରାମ ନିଚିଲ ତାରା ଦୁଜନକେ ଦେଖିତେ
ପେଲ ମେଯେରା ତାଦେର ଭେଡ଼ାକେ ଜଳ ଦେଓଯାର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଛେ । ମେଣ୍ଡଲୋ
କରେଛିଲେନ ହଜରତ ମୁସା ଆ ସାହାଯ୍ୟ ମେଯେଦେର ପିତା ହଜରତ ମୁସା (ଆ.)କେ
ଡାକା ହୁଏ ଏବଂ ତାର ମେଯେର ସାଥେ ବିଯେ ଅଫାର କରା ହୁଯେଛେ । ହଜରତ ମୁସା ଆ
ସାଫୁରା ବିବାହିତ ଏବଂ ଦଶ ବହୁ ମାଦିଆନେ ଅବସ୍ଥାନ କରଲେନ ।

একদিন হজরত মুসা আ পরিবার তাদের সাথে ভ্রমণ করছিল একটি পর্বত মত
কিন্তু এক আগুন ওরা কাছে গেলে দেখল, সেখান থেকে আল্লাহর আওয়াজ

আমি:

"হে মুসা! আমিই তোমার প্রভু। আমি তোমাকে নবী করেছি। ফেরাউনের
কাছে যাও এবং তার কাছে আমার বার্তা পোঁচ্চে দাও।"

মহান আল্লাহ হ্যরত মুসা আ দুটি অলৌকিক ঘটনা মঞ্জুর করা হয়েছে:

তাদের লাঠি সাপ হয়ে ওঠে •

তাদের চকচকে হাত অনুভূত •

মূসা ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ বললেন:

"ভয় করো না, আমি তোমার সাথে আছি।"

হজরত মুসা আ মিশর-এ ফেরত যান এসে ফেরাউনের দরবারে গিয়ে বলল:

"হে ফেরাউন! বনী ইসরাইলকে মুক্ত কর এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত
কর।"

ফেরাউন গর্ব হেসে বললো:

"আমি তোমার পরম প্রভু!"

হজরত মুসা আ নিজস্ব লাঠি মাটিতে ছুড়ে ফেলেছে যা সাপ হয়ে গেল এবং
ফেরাউনের জাদুকর এর জাদু গিলে ফেলেছে. কিন্তু ফেরাউন একগুঁয়ে
থাকল। এর উপর আল্লাহ তায়ালা ডুম প্রকাশিত:

রঞ্জ •

ব্যাঙ •

উকুন •

পঙ্গপাল •

বন্যা •

কিন্তু ফেরাউন তখনও রাজি হননি।

তখন আল্লাহ হজরত মুসাকে বনী ইসরাইলকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন
মিশর ত্যাগ কর. হজরত মুসা আ রাতের বেলায় তারা ইস্রায়েলের সভানদের
নিয়ে গেল। ফেরাউন লক্ষ্য তাদের সাথে সাধনা হয়রত মুসা (আঃ) এর সামনে
যা করলেন কালিজম সাগর (লাল সাগর) আর পিছনে ফেরাউন।

হজরত মুসা আ আল্লাহর কাছে দোয়া আল্লাহ বলেছেন:

"সমুদ্রের উপর তোমার লাঠি আঘাত করো।"

হজরত মুসা যখন লাঠিতে আঘাত করলেন সমুদ্র বিভক্ত এবং এর মধ্যে
শুকনো পথ হজরত মুসা ও বনী ইসরাইল হন এইভাবে পাস করেছে. যখন
ফেরাউন তাড়া করল সমুদ্র আবার মিলিত হয় আর ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে
নিমজ্জিত।

বনী ইসরাইলের কাছে হজরত মুসা আ একটি পর্বত মত তিনি তা গ্রহণ করলেন
এবং আল্লাহর বাণী দিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন তোরাহ মঙ্গুর
করে হজরত মুসা বললেন:

"আল্লাহর আনুগাত্য কর, তিনিই তোমাকে রক্ষা করেছেন।"

পূর্ববর্তী

আমাদের কাছে হজরত মুসা (আ.)-এর জীবন বিশ্বাস, ধৈর্য, বীরত্ব ও আল্লাহর
উপর ভরসা তাকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিক্ষা দেয় সত্ত্যের কঠস্বর তিনি
তাদের উঠাতে থাকলেন এবং আল্লাহ তাদের উঠিয়ে দিলেন খুলতে মঙ্গুর

তথ্যসূত্র

পরিত্র কুরআন: সূরা আল আরাফ (আয়াত 103-137) •

পরিত্র কুরআন: সূরা বৃহা, সূরা কাসাস •

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৯০ •

জীবনী: ইবনে কাথির, নবীদের গল্প, পৃ. 195-210 •

1. মূসাকে বাঁচানোর জন্য তার মাকী করেছিলেন?
 2. মূসাকে থায় বড় হয়েছিলেন?
 3. মোশিমিদিয়নে কাকে সাহায্য করেছিলেন?
 4. ঈশ্বর মূসাকে কী অলৌকিক কাজ দিয়েছিলেন?
 5. মূসাকিভাবে সমুদ্র পার হয়েছিলেন?
 6. ফেরাউনের পরিণতি কি হয়েছিল?
-

(14)



হজরত হারুন (আ.)-এর জীবন ও ত্যাগ

অনেক বছর আগের কথা মিশর নামক এক নবী বাস করতেন হজরত হারুন (আ.) তিনি ছিলেন হজরত মুসা (আ.)। কে বড় ভাই ছিল। হযরত হারুন হায়াত রহ শাস্ত, খাঁটি হাদয়, দয়ালু এবং ধৈর্যশীল তারা মানুষ ছিল। তাদের কথোপকথনে প্রভাব ছিল, এবং মানুষ তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন মহান আল্লাহ হযরত হারুনকে হযরত মুসা (আঃ) এর সাথে বানিয়েছিলেন বনী ইসরাইলদের হেদায়েত দায়িত্ব অপর্ণ করলেও তার কাহিনীর সাথে হযরত মুসা (আ.) এর কাহিনী সংযুক্ত রয়েছে ব্যক্তিগত ত্যাগ ও চরিত্র এছাড়াও খুব

গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত হারুন যখন জন্মগ্রহণ করেন ফেরাউন বনী ইসরাইলের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল। তিনি তার ছোট ভাই মুসা থেকে অনেক ভালবাসা করতেন হজরত মুসা যখন ফেরাউনের প্রাসাদে বড় হচ্ছিলেন, তখন হজরত হারুন ইসরাইল সন্তানদের মধ্যে ছিলেন। মিশরে অবস্থিত সে তার জাতির ছিল দুঃখ দেখা এবং আল্লাহর কাছে দোয়া যাতে তারা রক্ষা পায়।

যখন হজরত মুসা আ মিদিয়ান গিয়েছিলেন, হজরত হারুন মিসরে এবং বনী

ইসরাইলে অবস্থান করেন সান্ত্বনা দিতে থাকুন। তারা বলে:

"আল্লাহ আমাদের মুক্ত করবেন, ধৈর্য ধরুন।"

হজরত মুসা যখন মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আল্লাহ তাকে দান করেন

ভাববাণী অতঃপর হজরত মুসা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন:

"তে আমার রব! আমার জিহ্বায় গিঁট আছে, আমার ভাই হারুনকে আমার সাথে
নবী করুন, তিনি আরও বাঞ্চী।"

মহান আল্লাহ হজরত মুসা (আ.)-এর কাছে দোয়া করলেন গৃহীত বলেন এবং

হযরত হারুনকেও ভাববাণী মঞ্চুর করে আল্লাহ বলেছেন:

"তে মুসা! তুমি এবং তোমার ভাই হারুন আমার বার্তা নিয়ে ফেরাউনের কাছে
যাও।"

হজরত হারুন খুশিতে হজরত মুসা আ ফেরাউনের প্রাসাদ আমি গিয়েছিলাম
দুজনেই ফেরাউনকে বললেন:

"তে ফেরাউন! বনী ইসরাইলকে মুক্ত কর এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত
কর।"

হ্যরত হারুনের কথা আনন্দদায়ক ছিল, কিন্তু ফেরাউন অহংকার বলেছেন:

"আমি তোমার পরম প্রভু!"

হজরত মুসা আ আপনার নিজের অলৌকিক ঘটনা দেখানো হয়েছে: তার লাঠি
সাপ হজরত হারুন আল্লাহ করলেন ব্যাখ্যা এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে
ডাকতেন। কিন্তু ফেরাউন ও তার দরবারীরা বিশ্বাস হয় না।

হজরত মুসা (আ.)-এর হজরত হারুন আ পাশাপাশি তিনি ইস্রায়েলের
সন্তানদের কাছে থাকুন সাহস দিন এবং বলুন:

"আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন।"

যখন বনী ইসরাইলের সাথে হ্যরত মুসা আ কালিজম সাগর পার হওয়ার সময়
হ্যরত হারুনও সাথে ছিলেন। জনগণকে বললেন শান্ত হও রাখা হয়েছে এবং
আল্লাহর উপর বিশ্বাস বিতরণ করা

কিন্তু হজরত হারুনের জীবনে এক বড় পরীক্ষা এলেন যখন হজরত মুসা আ টর
পর্বত কিন্তু তোরাহ নিতে গেলে তারা হজরত হারুনকে বনী ইসরাইল বানিয়ে
দেন পাহারা দিচ্ছে কিছু লোক বলেছেন:

"আমরা মুসাকে দেখিনা, আমাদেরকে দেবতা বানাও।"

সামারিটান নাম দেওয়া ব্যক্তি সোনা থেকে একটি বাচ্চুর তৈরি যার মধ্যে
আওয়াজ হয়েছিল। তার লোকজন উপাসনা তারা এটা করতে শুরু করে।

তাদেরকে হ্যরত হারুন রা নিষেধ করতে এবং বললেন:

"এটা পাপ! শুধু আল্লাহর ইবাদত কর।"

কিন্তু জাতি তার কথা শুনেছে বিশ্বাস করবেন না।

হজরত মুসা ফিরে এলে এবং আ মূর্তি দেখেছি, তাই তারা রাগ আমি হ্যরত

হারুনকে বললাম,

"কেন আপনি তাদের থামাননি?"

হ্যরত হারুন ব্যাখ্যা করেন:

"আমি তাদের বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা আমার কথা শোনেনি। আমি ভয়

পেয়েছিলাম যে জাতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।"

জাতির কাছে হজরত মুসা আ দণ্ডিত এবং তাদের অনুত্তাপ হজরত হারুনকে
হজরত মুসা (আ.)-এর সাথে বনী ইসরাইলের কাছে ডাকলেন আল্লাহর কাছে
ফিরে যান আনা

হজরত হারুন (আ.)-এর জীবন আমাদের সেই শিক্ষা দেয় ভাইয়ের প্রতি
ভালোবাসা, ধৈর্য, ভদ্রতা এবং আল্লাহর পথে সাহায্য করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ
এক একজন সত্যিকারের নবী যারা ছিল জাতির সংস্কার তার জীবনের জন্য
বলিদান করুন যে আমাদের মনে করিয়ে দেয় আল্লাহ সর্বদা তাঁর নবীদের
সাহায্য করেন।

তথ্যসূত্র

পবিত্র কুরআন: সূরা বৃহা, সূরা আরাফ (আয়াত 142-150), সূরা •
কাসাম

হাদিস: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2376 •

জীবনী: ইবনে কাথির, নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 215-220 •

1. হযরত হারুন (আ.) কোন নবীর বড় ভাই ছিলেন?
2. হযরত হারুনের কথোপকথনে বিশেষ কী ছিল?
3. হযরত হারুনের জন্য হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর কাছে কী দোয়া
করেছিলেন?
4. হযরত হারুন ফেরাউনকে কী বলেছিলেন?

5. শমরীয় লোকেরা কী উপাসনা করেছিল?
6. হ্যারত হারন (রাঃ) কীভাবে লোকদের মূর্তি পূজা থেকে বিরত
রেখেছিলেন?
-

(15)

✿ হজরত খিয়র(আ.) ও হজরত মুসা(আ.) এর অঙ্গুত সফর

বহু বছর আগে পৃথিবীতে একজন রহস্যময় ব্যক্তিত্ব আমরা থাকতাম হ্যরত খিয়র (আ.) তিনি নামে পরিচিত আল্লাহর বিশেষ বান্দা যারা ছিলেন আল্লাহ তায়ালা করুণা এবং বিশেষ জ্ঞান এটি মঙ্গুর করা হয়েছিল। তার কাহিনী সাধারণ নবীদের মত নয়, একটি গোপন জ্ঞান আমরা তাদের গল্পে পূর্ণ হজরত মুসা (আ.)। জানার সাথে এক অঙ্গুত ভ্রমণের মধ্য দিয়ে, যা আমাদের শেখায় ঈশ্বরের পরিকল্পনা মানুষের বোঝার বাইরে এটা ঘটে।

এই গল্পটি শুরু হয় যখন কেউ হজরত মুসা (আ.)-কে জিজেস করেছিল:

"পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলেম কে?"

হজরত মুসা বললেন,

"আমি আছি।"

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসাকে সেই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন জ্ঞান একমাত্র
আল্লাহর কাছেই পরিপূর্ণ আল্লাহ হজরত মুসা (আ.)-এর কাছে অবতীর্ণ

করেছেন:

"দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে যাও, সেখানে আমার এক বান্দার সাথে দেখা হবে
যাকে আমি বিশেষ জ্ঞান দিয়েছি।"

তাঁর সঙ্গী হজরত মুসা আ ইয়োশুয়া বেন নুন তিনি নিজের সাথে একটি ভ্রমণে
গিয়েছিলেন একটি মাছ কেড়ে নিলেন মহান আল্লাহ বলেছেন:

"যেখানে মাছ অদৃশ্য হয়ে যায়, সেটাই মিলনের জায়গা।"

তারা দুই সাগর ও একের সঙ্গমে পৌঁছেছে শিলা সেখানে কাছাকাছি বিশ্রাম
মাছটি পাথরথেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল এটা লাগান। যিহোশূয়ু এটা
দেখলেও হজরত মুসা আ বলতে ভুলে গেছি. যখন তারা এগিয়ে গেল,

জোশুয়া বললেন:

"মাছটি পাথরথেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল!"

তারা সেখানে ফিরে গেল আল্লাহর একজন বান্দা দেখলেন, আল্লাহ যাকে
বিশেষ বিজ্ঞান কি দেওয়া হয়েছিল? সে হযরত খিয়র রা ছিল

হজরত মুসা বললেন,

"আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি এবং আগ্নাহ আপনাকে যে জ্ঞান
দিয়েছেন তা শিখতে পারি?"

হ্যরত খিদর (রাঃ) বললেনঃ

"হে মুসা! তুমি আমার প্রতি ধৈর্য ধরবে না। এবং আমি নিজেকে ব্যাখ্যা করা
পর্যন্ত প্রশ্ন করো না।"

হজরত মুসা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি ধৈর্য ধরবেন। তারপর উভয় যাত্রা শুরু
কি করেছে

প্রথম পর্ব:

এই এক জাহাজ যারা চড়েছে দরিদ্র মানুষ কে ছিলেন হ্যরত খিয়র রা নৌকায়
একটা গর্ত এটা কি হ্যরত মুসা (আঃ) বললেনঃ

"আপনি নৌকার ক্ষতি করলেন কেন? এটা গরীবদের!"

হ্যরত খিদর (রাঃ) বললেনঃ

"আমি বলেছিলাম তুমি ধৈর্য ধরবে না।"

হজরত মুসা ক্ষমা চাইলেন এবং নীরব থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা:

পথে তারা একটি ছেলে হ্যরত খিয়রকে দেখলেন তাকে মেরে ফেলেছে.

হজরত মুসা বললেন,

"আপনি কোন অপরাধ ছাড়া একটি নিরীহ জীবন হত্যা?"

হ্যরত খিয়র তখন একই কথা বললেনঃ

"আমি বলেছিলাম তুমি ধৈর্য ধরবে না।"

হজরত মুসা বললেন,

"যদি আমি এখন প্রশ্ন করি, আমাকে আটকে রাখবেন না।"

তৃতীয় ঘটনা:

এ এক গ্রাম আমি পৌঁছেছি। সেখানকার মানুষ আতিথেয়তা তিনি হজরত মুসা (আ.) ও হজরত খিজর (আ.)-কে বলেননি খাবারও দেয়নি. কিন্তু হ্যরত খিয়র সেখানে একটি করে দিলেন ভাঙ্গা দেয়াল দেখা এবং এটা ঠিক করা. হজরত

মুসা বললেন,

"আপনি তাদের জন্য কাজ করেছেন, কিন্তু তারা আমাদের কিছুই দেয়নি।

আপনি চাইলে আপনাকে কাজের জন্য অর্থ প্রদান করা যেতে পারে।"

তখন হ্যরত খিদর (রাঃ) বললেনঃ

"এটি সেই জিনিসগুলির সত্য যা আপনি সহ্য করতে পারেননি।"

অতঃপর হয়রত খিয়র (রা.) তিনটি ঘটনা ঘটান বুদ্ধি বলা হয়েছে:

জাহাজ আমি গর্ত করেছি তাই নিষ্ঠুর রাজা নেবেন না। তিনি শুধু ডান .1
নৌকা দখল নিতে ব্যবহৃত

ছেলে মেরে ফেলা হয়েছে কারণ সে বড় হয়েছে আপনার ধার্মিক .2
পিতামাতাকে বিভ্রান্ত করুন এটার জন্য আল্লাহ তাদের প্রতিদান
দেবেন শুধু বংশ মঙ্গুর করবে

প্রাচীর অধীনে দুই এতিমের ধন প্রাচীর যদি পড়ে যায়, তাহলে মানুষ .3
মূল্যবান হবে চুরি আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন যে এই শিশুরা বড়
হোক আপনার অধিকার পান.

হজরত মুসা অবাক হয়ে শুনলেন এবং বুঝতে পারলেন ঈশ্বরের জ্ঞান মানুষের
বুদ্ধির জোরে কোথাও উঁচু হয়

ঝঁ পূর্ববর্তী

হজরত খিদর (আ.)-এর ঘটনা আমাদের সেই শিক্ষা দেয় ধৈর্য, ন্যস্ততা এবং
আল্লাহর উপর ভরসা প্রতিটি ঘটনায় আল্লাহর প্রয়োজন গোপন করুণা এটি

বেদনাদায়ক মনে হলেও এটি ঘটে। হ্যরত খিয়রুল্লাহ রহ বিশেষ সেবক ছিল,
যারা জ্ঞান মঞ্চুর, এবং তাদের কর্ম আল্লাহর জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ছিল

তথ্যসূত্র

পবিত্র কুরআন: সূরা কাহফ (আয়াত ৬০-৮২) •

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪০৫ •

জীবনী: ইবনে কাথির, নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 225-230 •

1. হ্যরত মুসা (রাঃ) হ্যরত খিদ্রের সাথে সাক্ষাতের সংকেত
কোথাথে কেপেলেন?
 2. মুসা (আঃ) এর সাথে কারা গিয়েছিলেন?
 3. হ্যরত খিদ্র (রহঃ) নৌকায় কী করলেন?
 4. হ্যরত খিদ্র (রাঃ) কেন ছেলেটিকে হত্যা করলেন?
 5. হ্যরত খিদ্র (রাঃ) গ্রামের দেয়াল ঠিক করলেন কেন?
 6. হ্যরত মুসা (আঃ) যাত্রার শুরুতে হ্যরত মুসা (রাঃ) কে কি
উপদেশ দিয়েছিলেন?
-

(16)

✿ হজরত আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্যশীল জীবন।

অনেক বছর আগে একটি সুন্দর এলাকায় হজরত আইয়ুব (আ.)। সেখানে তিনি নামে একজন নবী বাস করতেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা হ্যরত আইয়ুব রা ধনী, দয়ালু এবং সৎ তারা ছিল বিস্তীর্ণ জমি, বাগান, অসংখ্য ভেড়া-ছাগল এবং এক বড় পরিবার তাঁর স্ত্রী ছিলেন (ঐতিহ্য অনুসারে করুণা) এবং শিশুরা তাদের খুব ভালবাসত। প্রতিদিন হ্যরত আইয়ুব রা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া পরিশোধ করা, গরীবদের খাওয়ান, এতিমদের দেখাশোনা করুন করবেন এবং রাতে উপাসনা আমি ব্যস্ত থাকব। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় পুঁজি তাদের বিশ্বাস ছিল হ্যরত আইয়ুবের জীবন আনন্দে ভরপুর তারা মাঠে কাজ করবে, বাচ্চাদের সাথে সময় কাটাবে এবং মানুষকে সাহায্য করবে। সর্বদা তাদের মুখে হাসি বাস করত। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের দিয়েছেন একটি মহান পরীক্ষা আমি কষ্ট পেয়েছি

ঐতিহ্য অনুযায়ী শয়তান আল্লাহকে বললেনঃ

"চাকরি আপনাকে ধন্যবাদ কারণ তার সবকিছু আছে। আপনি যদি তার কাছ

থেকে সবকিছু নিয়ে যান তবে সে আপনার নাম ভুলে যাবে।"

মহান আল্লাহ বলেন:

"আইয়ুবের বিশ্বাস মজবুত, তাকে পরীক্ষা কর, কিন্তু তার প্রাণ কেড়ে নিও
না।"

অতঃপর হ্যরত আইয়ুবের জীবনে আ ট্রায়াল একটি সিরিজ শুরু

প্রথম ঝড় এসেছে, যা তাদের ফসল ও বাগান খৎস করেছে। •

তারপর চোর তাদের ভেড়া এবং ছাগল লুট করে, এবং চাকর মারা
গেছে।

হ্যরত আইয়ুব বললেন, •

"আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা নিয়েছি। আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

তারপর একদিন তাদের সব শিশু তারা একটি বাড়িতে জড়ো হয়েছিল। হঠাৎ
ঝড় এসে বাড়ি পড়ে গেল। সব শিশু মারা গেছে। হজরত আইয়ুবের অন্তর
বিষাদে ভরা, তিনি মাটিতে বসে বললেন,

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সন্তান দান করেছেন, এবং আপনি তাদের
ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমি আপনার কাছেই ফিরে যাই।"

তারপর হজরত আইযুবের কাছে একটা কঠিন অসুখ এটা ঘটেছে। তাদের
শরীর ক্ষতে ভরা, যে দুর্বল সম্পর্কের লোকেরা তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল:
ইয়োবের উপর আল্লাহর গজব নেমে এসেছে।

কিন্তু তার স্ত্রী করুণা তাদের সাথে থাকুন। তারা তাদের সেবা করতে থাকো,
ক্ষত পরিষ্কার করুন করছেন, খাবার সরবরাহ করুন কার্তি এবং সাম্মান কখনো
হ্যরত আইযুবকে দিতেন অভিযোগ না, শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রার্থনা
করতে থাকুন:

"হে আমার পালনকর্তা! আমি কষ্ট পেয়েছি এবং আপনি পরম করুণাময়।"

(সূরা আম্বিয়া : ৮৩)

এই রাজে বহু বছর কেটে গেল। একদিন তার স্ত্রী বললেন,

"হে চাকরি! আরোগ্যের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন।"

হ্যরত আইযুব হেসে বললেন,

"যত বছর সুখে কাটিয়েছি, তত বছর কষ্টে কাটিয়ে দিলেই প্রার্থনা করব।"

তারপর তারা নশ্বভাবে প্রার্থনা করুন এরঃ

"হে আমার পালনকর্তা! আমি কষ্ট পেয়েছি এবং আপনি পরম করুণাময়।"

আল্লাহ তায়ালা হ্যরত আইয়ুব রা গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয় বলেন তিনি

বলেনঃ

"তোমার পা মাটিতে আঘাত কর, স্নান করে পান করার জন্য এটি ঠাভা জল।"

(সূরা: 42)

হজরত আইয়ুব মাটিতে আঘাত করলেন এবং সেখান থেকে ফোয়ারা ফেটে

গেল. তিনি এই জল থেকে স্নান করে পান করলেন. সঙ্গে সঙ্গে তাদের ক্ষত

সেরেছে সম্পন্ন, শরীর শক্তিশালী সম্পন্ন, এবং যে আবার তরুণ সম্পন্ন হ্যরত
আইয়ুব রা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া পরিশোধ করা

আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন দোয়া দ্বিগুণ করুন অনুদানঃ

জমি, ফসল এবং পণ্য •

নতুন বংশধর •

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা •

লোকেরা ফিরে এসে বললঃ

"হে চাকরি! তুমি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা।"

হ্যরত আইয়ুব বললেন,

"আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করলেন, তারপর আমার প্রতি দয়া করলেন।"

সারাজীবন কাটিয়ে দিলেন আল্লাহর ইবাদত আমি ব্যয় করেছি তিনি তাঁর

লোকদের বলতেন:

"হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর আনুগত্য কর, তাঁর উপর ভরসা কর। তিনি তাঁর
বান্দাদের কখনো পরিত্যাগ করেন না।"

পূর্ববর্তী

হজরত আইয়ুবের ঘটনা আমাদের সেই শিক্ষা দেয় ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং
আল্লাহর উপর ভরসা এটি সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। বিচারের পর আল্লাহ করণা এবং
আনন্দ হ্যরত আইয়ুবের ধৈর্যদান করেন আমাদের সবার জন্য একটি উদাহরণ
হয়

তথ্যসূত্র

পবিত্র কুরআন: সূরা আল আসিয়া (আয়াত 83-84) •

পবিত্র কুরআন: সূরা এস (আয়াত 41-44) •

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদীস নং 3391 •

জীবনী: ইবনে কাথির, নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 235-240 •

1. হযরতআইয়ুব(আ.)এরকি নেয়ামত ছিল?
2. পরীক্ষারসময় নবীইয়োবকী বলেছিলেন?
3. নবীআইয়ুবকোনরোগে ভুগছিলেন?
4. ইয়োবের স্ত্রী কীভাবে তাকে সেবা করেছিলেন?
5. হযরতআইয়ুব আরোগ্যের জন্য কী দোয়া করেছিলেন?
6. মহান আল্লাহকিভাবে হযরতআইয়ুবকে সুস্থ করে তুললেন?

(17)

ঘৰত ইউনুস (আঃ) এর কাহিনী

বহু বছর আগে, নিনেভ নামক একটি বড় শহরে যোনা নামে একজন ভাববাদী
বাস করতেন। নিনেভে ছিল একটি ব্যস্ত শহর, যেখানে লোকেরা ব্যবসা করত,
বড় বড় বাড়িতে বাস করত এবং বাজারে তাদের সময় হাসি-আনন্দে কাটাত।
কিন্তু এই শহরের মানুষ ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছিল। তারা মিথ্যা কথা, প্রতারণা
এবং একে অপরকে আঘাত করার মতো পাপ কাজ করেছিল। তাদের হৃদয়
পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল।

অতঃপর আল্লাহ ইউনুস (আঃ)-কে তাদের কাছে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন।
যোনা শান্ত ও সাহসী ছিলেন। তার কথায় সত্য ছিল এবং চোখে ছিল দয়ার
আলো। তিনি নিনেভের বাজারে দাঁড়িয়ে বললেন:
"হে আমার সম্প্রদায়! এই পাপ পরিত্যাগ কর। একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা কর।
তিনি তোমাদের এই শহর ও জীবন দিয়েছেন। তাঁর কাছে তওবা কর।"

কিন্তু মানুষ তার কথা শোনেনি। তিনি হেসে বললেন,
"জোনস, তুমি শুধু ভয় পাচ্ছ। আমরা আমাদের নিজেদের জীবন যাপন

করব।"

ইউনুস দিনরাত চেষ্টা করেও লোকে তাকে ঠাট্টা করে।

জোনাহ অবশ্যে হতাশ হয়েছিলেন। সে ভাবল,

"এই লোকেরা কখনই ঈশ্বরের আনুগত্য করবে না।"

তিনি ঈশ্বরের অনুমতি ছাড়াই নিনেভেহ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি একটি
নৌকায় উঠে সমুদ্রে গেলেন। কিন্তু আল্লাহর তাকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

নৌকাটি সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছে বড়ের কবলে পড়ে। নৌকায় টেউ আছড়ে

পড়তে থাকে। নাবিকরা ভয় পেয়ে বলল,

"কারো পাপের কারণে এই বাড় এসেছে। কে দোষী তা খুঁজে বের করার জন্য

আমরা লট আঁকব।"

ইউনুসের নাম উঠে আসে লটারিতে। ইউনুস বুঝতে পারলেন এটা আল্লাহর
পক্ষ থেকে একটি নির্দশন। তিনি বললেনঃ

"আমাকে সমুদ্রে ফেলে দাও, বাড় থেমে যাবে।"

নাবিকরা তাকে সমুদ্রে ফেলে দিল। বাড় থেমে গেল।

কিন্তু যোনার গল্প সেখানেই শেষ হয় না। ঈশ্বর একটি বড় মাছের আদেশ
দিলেন, এবং তা যোনাকে গিলে ফেলল। জোনাহ মাছের পেটে অন্ধকারে
শুয়ে ছিলেন। তিনি ভয় পেলেও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। তিনি
বললেনঃ

"হে আল্লাহ! আমি ভুল করেছি। তোমার আদেশ না মেনেই আমি শহর
ছেড়েছি। আমাকে ক্ষমা করুন। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।"

তিনি অন্তর থেকে প্রার্থনা করলেন:

তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; তুমি মহিমাপ্রিত। নিশ্চয় আমি জালেমদের
অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

(সূরা আল-আব্রিয়া, আয়াত 87)

এই প্রার্থনা ছিল তার হৃদয়ের কান্না। আল্লাহ ইউনুসের তওবা করুল করলেন।
তিনি মাছটিকে আদেশ দিলেন ইউনাহকে সমুদ্রতীরে ছেড়ে দিতে। মাছটি
যোনাকে তীরে ফেলে দিল। জোনা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফাঁকা জায়গায় শুয়ে
ছিলেন। আল্লাহ তার জন্য একটি কুমড়া গাছ জন্মান। গাছের ছায়া যোনাকে
সান্ত্বনা দিল।

জোনাহ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তখন
আল্লাহ ইউনুসকে নিনেভে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। যোনা শহরে ফিরে
গেলেন। তিনি বললেনঃ

"হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর কাছে তাওবা কর, তিনি তোমাদের ক্ষমা
করবেন। যদি তোমরা তাওবা না কর, তাহলে আল্লাহর শাস্তি আসবে।"

এখন নীনবীর লোকেরা তাঁর কথা শুনছিল। সে ভয় পেয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা
প্রার্থনা করল। তারা পাপ ত্যাগ করেছে। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিলেন
এবং শাস্তি থেকে রক্ষা করলেন।

জোনা খুশি হলেন। তিনি বুবাতে পারলেন যে, আল্লাহর হৃকুম থেকে রেহাই
নেই। তার গল্ল আমাদের ভুল করলে অনুতপ্ত হতে শেখায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল,
তিনি তাঁর বাল্দাদের কখনো পরিত্যাগ করেন না। জোনার প্রার্থনা আমাদের
মনে করিয়ে দেয় যে আমরা কষ্টের সময়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে চাই।

□ তথ্যসূত্র:

পবিত্র কুরআন: সূরা আল আম্বিয়া (আয়াত 87-88), সূরা আস-

সাফাত (আয়াত 139-148)

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৯৫ •

জীবনী: ইবনে কাথির, নবীদের গল্ল, পৃষ্ঠা 245-250 •

1. হ্যরত ইউনুস (আ.) কোন শহর থেকে এসেছিলেন?
2. হ্যরত ইউনুস (রাঃ) তাঁর উম্মদদের কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

3. হ্যরত ইউনূসকে নৌকা থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলো কেন?
 4. হ্যরত ইউনূস (রা.) মাছের পেটে কি নামাজ পাঠ করতেন?
 5. হ্যরত ইউনূস (রাঃ) এর জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা কোন গাছ
রোপণ করেছিলেন?
 6. শেষ পর্যন্ত নীনবীর লোকেরা কী করেছিল যা তাদের শাস্তি থেকে
রক্ষা করেছিল?
-

(18)

ঝুলকিফল (আ.)-এর কাহিনী।

অনেক বছর আগে একটা নিরবিলি গ্রামে জুলকিফল সেখানে একজন ভালো
মানুষ বাস করতেন, তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় ও ধৈর্যশীল বান্দাদের মধ্যে।
জুলকিফলের গল্লাটি একটু ছোট, তবে এটি আমাদের কর্তব্য, ন্যায়বিচার এবং
ধৈর্যের গুরুত্ব শেখায়। তাঁর নামের অর্থ "দায়িত্ব বহনকারী" কারণ তিনি সর্বদা
আল্লাহর হৃকুম এবং মানুষের অধিকার পালন করেছেন।

জুলকিফাল ছিলেন জ্ঞানী, দয়ালু এবং শান্ত। সবুজ মাঠ, বাগান আর ছোট ছোট
ঝর্ণা দিয়ে ঘেরা ছিল তাদের গ্রাম। গ্রামবাসীরা তাকে অনেক সম্মান করত,
কারণ তিনি সর্বদা সত্য কথা বলতেন, দরিদ্রদের খাওয়াতেন, হাসতেন এবং
বাচ্চাদের সাথে গল্ল করতেন। কিন্তু গ্রামের কিছু লোক আল্লাহকে ভুলে
গিয়েছিল। তারা চুরি, প্রতারণা এবং একে অপরের প্রতি অবিচারের মতো পাপ
করেছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে একজন ধার্মিক ও ধৈর্যশীল নেতা
হিসেবে যুল-কাফিলকে নিযুক্ত করেছেন।

চুল-কফিল গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল,

"হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর আনুগত্য কর। তিনি তোমাদের এই ফসল, এই
পানি, এই জীবন দিয়েছেন। তোমাদের পাপ ত্যাগ করে তাঁর কাছে ফিরে
যাও।"

তার কথায় এত শক্তি ছিল যে কিছু লোক তার কথা শুনত। তারা তওবা করে
আল্লাহর পথে ফিরে আসে। কিন্তু কিছু মানুষ অনড় ছিল। তিনি বললেনঃ

"জোলকিফল, তুমি শুধু হমকি দিচ্ছ। আমরা আমাদের পথে যাব।"
জুলকিফল ধৈর্যশীল ছিল। তিনি দিনরাত মানুষকে বুঝিয়েছেন।

জুলকিফলের জীবনের একটি বড় পরীক্ষা ছিল তার দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা।
একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, হ্যরত ইলিসা (আ.) উত্তরাধিকারীর জন্য তিনটি
শর্ত বেঁধেছিলেন:

সারাদিন উপবাস .1

সারারাত নামাজ পড়ে .2

কখনো রাগ করবেন না .3

যুল-কিফাল এই দায়িত্ব গ্রহণ করে বললেন:

"হে আল্লাহ! আমি তোমার আদেশ পালন করব।"

তারা দিনরাত ইবাদত করত, নামাজ পড়ত, কোরআন তেলাওয়াত করত এবং

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করত। শয়তান তাদের ঘুমাতে উত্সাহিত করেছিল,

ফিসফিস করে বলেছিল:

"যুলকিফিল, একটু ঘুমাও, কেউ দেখছেনা।"

তবে হারেননি জুলকিফিল। তিনি ধৈর্যধরে তাঁর ইবাদত চালিয়ে যান। তাদের

ধৈর্য ও সেবায় আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। তিনি যুল-কাফিলকে অধিকতর জ্ঞান ও

সম্মান দান করেন।

একবার জুলকিফিল তার গ্রামের বিচারক নিযুক্ত হন। তিনি সবসময় একটি

ন্যায্য সিদ্ধান্ত নিতেন। একদিন দু'জন লোক তার কাছে এসে তর্ক করতে

লাগল। একজন বলেছেন:

"এই লোকটা আমার জমি কেড়ে নিয়েছে।"

আরেকজন বলেছেন:

"না, এই জমি আমার!"

জুলকাফিল তার কাছে প্রমাণ চাইলেন। তিনি গ্রামের প্রবীণদের সাথে কথা

বলে জমির দলিল দেখেন। অবশেষে তারা ন্যায়পরায়ণদের পক্ষে রায় দিল।

যে লোকটি জমির মালিক সে তার জমি ফিরে পেয়েছে। লোকেরা যখন তার

ন্যায়বিচার দেখল, তারা বলল:

"যুল-কাফিল আল্লাহর উত্তম বান্দা, তারা কখনো পক্ষপাতিত্ব করেন না।"

যুল-কাফিলের আরেকটি বড় কাজ ছিল তার লোকদেরকে আল্লাহর পথে

আহ্বান করা। তিনি গ্রামের শিশুদের গল্প শোনাতেন এবং বলতেন:

"বাচ্চারা! সর্বদা সত্য কথা বল, আল্লাহ সত্যবাদীদের পছন্দ করেন।"

তিনি গরীবদের জন্য খাবার সংগ্রহ করতেন এবং অসুস্থদের দেখতে যেতেন।

তাদের গ্রাম ধীরে ধীরে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে। যারা আগে পাপ করেছে,

তারা অনুতপ্ত হতে শুরু করেছে। জুলকিফলের ধৈর্য ও দয়া গ্রামটিকে

আবারও শান্তিপূর্ণ করে তুলেছিল।

যখন যুল-কাফিল বৃক্ষ হয়ে গেল, তখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন:

"আল্লাহকে কখনো ভুলে যেও না। তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলুন এবং একে

অপরের প্রতি সদয় হোন।"

তিনি শান্তিতে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। আল্লাহ তাদের জানাতে স্থান

দিয়েছেন।

জুলকিফলের গল্প আমাদের শিক্ষা দেয় যে দায়িত্ব পালন করতে হবে, তা যত

কঠিনই হোক না কেন। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহর প্রিয়

বান্দা। তাদের জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ তার বান্দাদের
পরীক্ষা করেন, কিন্তু তাদের সাহায্যও করেন।

■ তথ্যসূত্র:

পবিত্র কুরআন: •

সূরা আল-আমিরা, আয়াত 85-86 ০

সূরা এস, আয়াত 48 ০

হাদিস ও তাফসির: •

তাফসির ইবনে কাসীর, সূরা আল-আমিরা, আয়াত 85- ০

86

ইবনে কাথির, নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 255-260 ০

1. হ্যরত জুলকিফল (আ.) এর নামের অর্থকি?
2. হ্যরত জুলকিফল তাঁর উম্মদদের কি উপদেশ দিয়েছিলেন?
3. হ্যরত জুলকিফল কোন তিনটি শর্ত পূরণ করেছিলেন?

4. হযরত জুলকিফল (রাঃ) এর গ্রামের দায়িত্ব কী ছিল?
 5. হযরত জুলকিফল শিশুদের কী শিক্ষা দিয়েছিলেন?
 6. শেষ পর্যন্ত হযরত জুলকিফলকে আল্লাহ তায়ালা কী পুরস্কার দিলেন?
-

(୧୯)

✿ হজরত ইলিয়াস (আ.)-এর সত্য ও শিক্ষণীয় ঘটনা

বহু বছর আগে বনী ইসরাইলের এক শহরে ইলিয়াস (আঃ) নামে এক নবী বাস করতেন। এ শহরের মানুষ এক সময় আল্লাহর পথে চললেও সময়ের সাথে সাথে পথভ্রষ্ট হয়। তারা আল্লাহকে ভুলে ‘বাল’ নামে একটি মূর্তি পূজা করতে শুরু করে। তারা মিথ্যা বলেছে, চুরি করেছে এবং গরীবদের উপর অত্যাচার করেছে। তাদের রাজা ও নিষ্ঠুর এবং বিদ্রোহী ছিলেন, যিনি বালের উপাসনা করেছিলেন এবং ঈশ্বরের নবীদের অবাধ্য ছিলেন।

তাদের সংক্ষারের জন্য আল্লাহ তায়ালা হজরত ইলিয়াস (আ.)-কে নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, সত্যবাদী ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তাঁর অস্তরে ছিল আল্লাহর ভালোবাসা এবং জিহ্বায় সত্যের আলো।
 তারা শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিকার করতে লাগল:

"হে আমার সম্প্রদায়! এই নিষ্পাগ মূর্তির পূজা ত্যাগ কর। একমাত্র আল্লাহর
ইবাদত কর, তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর কাছে তওবা কর এবং সরল পথ
অবলম্বন কর।"

কিন্তু জনগণ তার কথাকে তামাশা হিসেবে নিয়েছে। কিছু লোক হেসে বলল,
"এলিয়াহ! তুমি কি আমাদের দেবতা বালের বিরুদ্ধে কথা বলছ? তোমার মন
খারাপ!"

রাজার লোকেরা ইলিয়াসকে হৃষি দিয়েছিল:

"চুপ কর, নইলে মেরে ফেলা হবে!"

কিন্তু হজরত ইলিয়াস (আ.) ভয় পাননি, পিছু হটেননি। তিনি রাস্তা থেকে
রাস্তায় গিয়ে মানুষকে ব্যাখ্যা করলেন:

"কেন তুমি এই পাথরের মূর্তিকে পূজা কর? এটা শোনে না, কথাও বলে না।
আল্লাহই তোমাকে বৃষ্টি, ফসল ও জীবন দেন। তাঁর আনুগত্য কর!"

কিছু গরিব মানুষ ও শিশু তার কথায় বিশ্বাস করল। তিনি বললেনঃ

"হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনার আনুগত্য করব।"

কিন্তু রাজা ও তার পুরোহিতরা ক্ষিপ্ত হলেন। তারা হজরত ইলিয়াসকে গ্রেপ্তার করতে সৈন্য পাঠায়। হযরত ইলিয়াস পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া

করলেন:

"হে আমার প্রভু! আমার সম্প্রদায়কে হেদায়েত করুন, তাদের সঠিক পথ দেখান।"

আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন। শহরে থেমেছে বৃষ্টি। ফসল শুকিয়ে গেল,
ঝর্ণা শুকিয়ে গেল এবং মানুষ ক্ষুধার্ত। তারা রাজার কাছে গিয়ে বলল,

"বাল আমাদের কিছুই দিচ্ছেনা। আমরা ধৰংস হয়ে যাচ্ছি!"

রাজা বললেনঃ

"এটা সব ইলিয়াসের কৌশল! তাকে খুঁজে বের করা!"

হজরত ইলিয়াস (আ.) শহরে ফিরে এসে বাদশাহর সামনে দাঁড়ালেন এবং

বললেনঃ

"হে মহারাজ! তোমার ঈশ্বর তোমাকে বাঁচাতে পারেনি। এখনও সময় আছে,
ঈশ্বরের কাছে তওবা করো!"

রাজা রাগান্তি হলেন, কিন্তু প্রজারা ভয় পেল। হযরত ইলিয়াস বলেন,

"ଆସନ ଏକଟା ବିଚାର କରି । ତୋମାର ପୁରୋହିତ ବାଲକେ ଆଶ୍ରମ ନାମାବାର ଜନ୍ୟ
ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଏବଂ ଆମି ଈଶ୍ଵରେର କାହେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବ । ଦେଖା ଯାକ କେ
ସତ୍ୟବାଦୀ ।"

ରାଜା ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରେନ ।
ଶହରେ ଚତୁରେ ଦୁଟି ବେଦୀ ତୈରି କରା ହେଲିଛି । ବାଲେର ପୁରୋହିତରା କାଠ ମଂଗଳ
କରେ ସାରାଦିନ ବାଲକେ ଡାକତେ ଲାଗଲା:

"ହେ ବାଲ! ଆଶ୍ରମ ପାଠାଓ!"
କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହୟନି । ମାନୁଷ ହତବାକ ଏବଂ ବିଭାନ୍ତ ଛିଲ ।

ତଥନ ହଜରତ ଇଲିଯାସ (ଆ.) ଏଗିଯେ ଆସେନ । ତାରା ଆଶ୍ରମର ନାମେ ଏକଟି ବେଦୀ
ତୈରି କରେ, କାଠେର ଚାରପାଶେ ଜଳ ଚେଲେ ଦେଇ ଯାତେ କେଉ ତାଦେର ଜାଦୁବିଦ୍ୟାର
ଅଭିଯୋଗ ନା କରତେ ପାରେ । ତାରପର ତିନି ଆକାଶେର ଦିକେ ହାତ ତୁଲେ ଦୋଯା

କରଲେନୁ:

"ହେ ଆଶ୍ରମ! ଆପଣି ଆମାଦେର ପ୍ରଭୁ । ଏହି ଲୋକଦେର ଦେଖାନ ଯେ ଆପଣିଟି
ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ଵର!"

হঠাতে আকাশ থেকে আগুন নেমে এল। তিনি কাঠ, জল এবং বেদী পুড়িয়ে
দিলেন। লোকেরা অবাক হয়ে চিন্কার করে বললো:

"আল্লাহ সত্য! ইলিয়াস একজন সত্য নবী!"

মানুষ অনুতপ্ত, মৃত্তি ভেঙ্গে, এবং আল্লাহর ইবাদত শুরু কিন্তু রাজা ও তার
পুরোহিতরা অনড় রইলেন। তারা হ্যরত ইলিয়াসকে হত্যা করতে চেয়েছিল।
আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে রক্ষা করেন এবং পাহাড়ে আশ্রয় দেন। হ্যরত
ইলিয়াস সেখানে ইবাদত-বন্দেগি করেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

আল্লাহ অনেক বনী ইসরাইলকে হেদায়েত করেছিলেন।

পূর্ববর্তী

হজরত ইলিয়াস (আ.)-এর কাহিনী সমগ্র বিশ্ব বিরোধিতা করলেও সত্ত্বের
পক্ষে দাঁড়াতে শেখায়। আল্লাহর নবীদের পথ ধৈর্য, সাহস ও ঈমানের পথ।
তিনি ছিলেন একজন সাহসী, সত্য ও আল্লাহর প্রিয় নবী।

অধ্যয়নের জন্য ইঙ্গিত

পরিত্র কোরআন: সূরা আস-সাফাত, আয়াত 123-132 •

পবিত্র কুরআন: সূরা ইনাম, আয়াত 85 •

তাফসির ইবনে কাছীর: সূরা আস-সাফাত, আয়াত 123-132 •

ইবনে কাথির দ্বারা নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 265-270 •

1. ইলিয়াস (আ.) কোন জাতির নবী ছিলেন?
2. জাতি কোন মূর্তির পূজা করত?
3. হ্যরত ইলিয়াস (রাঃ) তাঁর উম্মদদের কি উপদেশ দিয়েছিলেন?
4. আল্লাহ কেন বৃষ্টি থামিয়ে দিলেন?
5. এলিয় বেদীর ওপর কোন অলৌকিক কাজ করেছিলেন?
6. হ্যরত ইলিয়াসের অলৌকিক ঘটনা দেখে মানুষ কী করলো?

(20)

✿ হজরতঙ্গসা (আ.) সত্য এবং শিক্ষণীয় গল্প

বহু বছর আগে বনী ইসরাঈলের এক গ্রামে আল্লাহ এক মহান নবীকে পাঠান,
যার নাম ছিল ঙসা। তিনি ছিলেন মরিয়মের পুত্র, এবং আল্লাহ অলৌকিকভাবে
তাকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। হজরত ঙসা (আ.) হজরত ইয়াহিয়া
(আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল বনী ইসরাঈলকে আল্লাহর
দিকে ফিরিয়ে আনা।

সে সময় বনী ইসরাঈলের লোকেরা আবারও বিভ্রান্তিতে পড়েছিল। কেউ মূর্তি
পূজা করত, কেউ কেউ দরিদ্রদের নিপীড়ন করত এবং সমাজে কলহ, অবিচার
ও দুর্নীতি সাধারণ ছিল। মহান আল্লাহর তাদের সরল পথ দেখানোর জন্য হজরত
ঙসা (আ.)-কে তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

হজরত ঙসা (আ.) ছিলেন অত্যন্ত শান্ত, জ্ঞানী ও দয়ালু। তার চেহারায় নূর
এবং অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ছিল। গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতেন,
"হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর আনুগত্য কর, তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা।
তোমাদের পাপ ত্যাগ করুন এবং তাঁর কাছে তওবা করুন।"

তার কথা ছিল মৃদু, কিন্তু হৃদয় বিদারক। তিনি শিশুদের সত্য, প্রার্থনা এবং

নৈতিক শিক্ষা দিতেন। বলেছেন:

"বাচ্চারা! সর্বদা সত্য কথা বল, যারা সত্য কথা বলে আল্লাহ তাদের

ভালোবাসেন।"

কিছু লোক তার কথা শুনল, তওবা করল এবং আল্লাহর পথে ফিরে গেল। কিন্তু

কিছু একগুঁয়ে মানুষ তাদের পুরানো পথে আটকে আছে। তিনি বললেনঃ

"যীশু! আমরা আমাদের প্রবীণদের পথ পরিত্যাগ করব না।"

হজরত ঈসা (আ.)-এর অন্যতম প্রধান কাজ ছিল তাঁর জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি মানুষের বিরোধ নিষ্পত্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতেন। একদিন

দুই প্রতিবেশী তার কাছে এলো। একজন বলেছেনঃ

"এই লোকটি আমার গাছ থেকে ফল চুরি করে।"

আরেকজন বলেছেনঃ

"না, এই ফল আমার গাছের!"

যীশু গাছটি পরীক্ষা করলেন, গ্রামের প্রবীণদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং
একটি ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত দিলেন। লোকেরা যখন তার ন্যায়বিচার দেখল, তারা

বলল:

"নিশ্চয়ই ঈসা (আঃ) আল্লাহর প্রকৃত রসূল!"

হজরত ঈসা (আ.) গরীবদের সাহায্য করতেন। একবার গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা
দিল। ফসল দুষ্প্রাপ্য, এবং মানুষ অনাহার ছিল। ঈসা (আঃ) তার খাবার
গরীবদের মধ্যে বিতরণ করলেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন:

"হে আল্লাহ! আমার উন্নতের প্রতি রহম করুন।"

আল্লাহ তাদের দোয়া করুল করেন। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ল, পৃথিবী শস্য
উৎপন্ন করলো এবং মানুষ সমৃদ্ধ হল। তিনি বললেনঃ

"আমরা যীশুর প্রার্থনা দ্বারা সংরক্ষিত হয়।"

হজরত ঈসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে থাকেন।

তিনি বলতেনঃ

"আল্লাহর আনুগত্য করো, তিনি তোমাকে কখনো একাছেড়ে যাবেন না।"

তিনি শিশুদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, দরিদ্রদের পোশাক এবং খাবার দিয়েছেন এবং সর্বদা ধৈর্য ও ভালবাসা দেখিয়েছেন। তার নৃতা ও সদাচরণে মানুষ ধীরে ধীরে আল্লাহর পথে ফিরে আসে।

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে, যীশুকে বৃক্ষ হওয়ার আগেই ঈশ্বর জীবিত করে তুলেছিলেন। তারা মরেনি, ক্রুশবিদ্ধও হয়নি, কিন্তু আল্লাহ তাদের আশ্রয়ে নিয়েছেন। কেয়ামতের কাছে তারা পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং ন্যায়-অন্যায় বিচার করবে।

পূর্ববর্তী

যীশুর গল্প আমাদের শিক্ষা দেয় যে আল্লাহর পথে কাজ করা, ধৈর্যশীল হওয়া এবং মানুষকে ভালবাসার সাথে পরিচালিত করা ইবাদতের সবচেয়ে বড় রূপ।

তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন সত্য, করুণাময় ও মহান নবী, যিনি তাঁর জনগণকে ন্যায়বিচার, করুণা ও একেশ্বরবাদের দিকে আহ্বান করেছিলেন।

অধ্যয়নের জন্য ইঙ্গিত

পরিত্র কুরআন: সূরা ইনাম, আয়াত 86 •

পরিত্র কুরআন: সূরা সাদ, আয়াত 48 •

পরিত্র কুরআন: সূরা নিসা, আয়াত 157-158 •

তাফসির ইবনে কাসীর: সূরা ইনাম, আয়াত 86 •

ইবনে কাথির দ্বারা নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 275-280 •

1. যিশুর মায়ের নাম কি?
2. যিশু তাঁর লোকেদের কী পরামর্শ দিয়েছিলেন?
3. যিশু ছেলেমেয়েদের কী শিখিয়েছিলেন?
4. কীভাবে যিশু দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বিরোধের সমাধান করেছিলেন?
5. দুর্ভিক্ষের সময় যিশু কী করেছিলেন?
6. সর্বশত্রুমান আল্লাহ তায়ালা সৈসা মসীহ (আঃ) কে কোন স্থান
দিলেন?

(২১)

হজরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা

বহু বছর আগে ইস্রায়েলের একটি শহরে দাউদ নামে এক নবী বাস করতেন।

তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা, একজন সাহসী যোদ্ধা ও ন্যায়পরায়ণ রাজা।

ডেভিডের গল্ল শুধুমাত্র যুদ্ধ এবং বিজয় সম্পর্কে নয়, তবে এটি আমাদের শেখায় যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা, তাঁর উপাসনা করা এবং ন্যায়বিচার বজায় রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। দাউদের কঠিন এতই মধুর ছিল যে পাহাড় ও পাথিরাও তাঁর সাথে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করত।

দাউদের সময় ইস্রায়েলীয়রা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ছিল। তাদের শক্ত ছিল গোলিয়াথ, একজন পরাক্রমশালী এবং পরাক্রমশালী যোদ্ধা এবং তার নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী ইসরাইলদেরকে আতঙ্কিত করছিল। ইসরাইলদের নেতা ছিলেন তালুত, যিনি একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। দাউদ তখন একজন যুবক, যে তার পিতার ভেড়া চরাতেন, কিন্তু তার হাদয়ে ছিল সাহস, বিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা।

একদিন দাউদ তার পিতার অনুরোধে তালুতের বাহিনীর কাছে খাবার নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি গোলিয়াথকে সবাইকে চ্যালেঞ্জ করতে শুনলেন।

গলিয়াথ বলল: "এমন কেউ কি আছে যে আমার সাথে দেখা করতে পারে?"

ইস্রায়েলীয়দের কেউ সাহস করেনি। দাউদ তালুতের কাছে গিয়ে বললেন:

"আমি গলিয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" তালুত অবাক হলেন। তিনি

বলেছিলেন: "ডেভিড, তুমি একটি ছেলে, এবং গলিয়াথ একজন শক্তিশালী

যোদ্ধা!" দাউদ উত্তর দিলেন: "আল্লাহ আমার সাথে আছেন এবং আমি তাঁর

উপর ভরসা করি।"

দাউদ যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। তার একটাই আছে গ্যালিলি এবং কয়েক পাথর

গোলিয়াথ কি তাকে উপহাস করেছিল? কিন্তু দায়ুদ গালীল থেকে ঈশ্বরের

নামে একটি পাথর নিষ্কেপ করেছিলেন, যা গোলিয়াথের কপ্তান গোলিয়াথ

মাটিতে পড়ে মারা গেল। দাউদ জয়ী হয়েছেন বলে ইস্রায়েলীয়রা আনন্দে

চিৎকার করে উঠল।

এই বিজয়ের পর দাউদ বনী ইসরাইলের নায়ক হয়ে ওঠেন। তালুত তাকে

সম্মান করেছিলেন এবং পরে দাউদকে ঈশ্বরের দ্বারা রাজা ও নবী করা

হয়েছিল। দাউদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সাম্মতাত্ত্ব, যা ছিল আল্লাহর প্রশংসা

সম্মতি একটি গ্রন্থ। দায়ুদ যখন গীতসংগীত পাঠ করলেন, তখন পাঠাড় এবং

পাখিরা তার সাথে গান গাইত। দাউদ বলতেন: "হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর

শুকরিয়া আদায় কর, তিনিই আমাদের রক্ষা করেন।"

দাউদও একজন ন্যায় নবী ছিলেন। একবার দুইজন লোক তার কাছে বিচার চাইতে আসে। একজন বলল: "এই লোকটি আমার একটি ভেড়া নিয়ে গেছে।" আরেকজন বলল: "না, এটা আমার!" ডেভিড উভয়ের কথাই শুনেছিলেন, প্রমাণ দেখেছিলেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। লোকেরা বলত: "দাউদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর একজন নবী, তিনি কখনও পক্ষপাতিত্ব করেন না।"

ডেভিডের জীবনে একটি বিচার এসেছিল। একপর্যায়ে তারা তাড়াহুড়ো করে একটি সিদ্ধান্ত নেন, যার জন্য আল্লাহ তাদের সতর্ক করেন। দাউদ সাথে সাথে আল্লাহকে জিজেস করলেন অনুত্তপ্রকি, কাঁদতে কাঁদতে বললেন: "হে আল্লাহ! আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।" আল্লাহ তাদের তওবা করুল করেছেন। দাউদ সারা জীবন আল্লাহর ইবাদত, ন্যায়বিচার ও জাতির হেদায়েতের মধ্যে অতিবাহিত করেন। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলতেনঃ আল্লাহর আনুগত্য কর, তিনি ক্ষমাশীল।

হজরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, বিশ্বাস, সাহসিকতা, ন্যায়বিচার ও অনুত্তপ্রকি একজন মানুষকে আল্লাহর প্রিয় করে তুলতে পারে। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় নবী, যার জীবন প্রতিটি যুগের মানুষের জন্য অনুকরণীয়।

 তথ্যসূত্র:

পবিত্র কুরআন: সূরা বাকারা (আয়াত 246-251), সূরা এস (আয়াত •

17-26)

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদীস নং 3424 •

জীবনী: ইবনে কাথির, নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 285-290 •

1. হ্যরত দাউদ (আ.) কোন জাতির নবী ছিলেন?
 2. গোলিয়াথকে ছিলেন এবং তিনি কী করছিলেন?
 3. কীভাবে দায়ুদ গোলিয়াথকে পরাজিত করেছিলেন?
 4. হ্যরত দাউদ (রাঃ) কে আল্লাহ তাআলা কোন কিতাব দিয়েছেন?
 5. হ্যরত দাউদ (আ.) এর পবিত্রতা কে করত?
 6. হ্যরত দাউদ (আঃ) কোন মুহূর্তে আল্লাহর কাছে তওবা করলেন?
-

(২২)



হজরতসুলাইমান(আ.)-এরঘটনা

বহু বছর আগে ইস্রায়েলের একটি মহান রাজ্য সোলায়মান নামে একজন নবী
বাস করতেন। তিনি ছিলেন হজরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র। সোলায়মান শুধু
একজন রাজাই ছিলেন না, আল্লাহর প্রিয় নবীও ছিলেন। আল্লাহ তাকে এমন
জ্ঞান ও ক্ষমতা দিয়েছিলেন যে তিনি পশু-পাখি এমনকি জীবের সাথে কথা
বলতে পারতেন। তাদের গল্প আমাদের শেখায় জ্ঞান, ন্যায়বিচার এবং বিশ্বাস
কর্তৃ গুরুত্বপূর্ণ।

সোলায়মান যখন ছোট ছিলেন, তখন তিনি তাঁর পিতা দাউদের কাছ থেকে
আল্লাহর পথ শিখেছিলেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও জ্ঞানী ছিলেন। দাউদ (আঃ)
এর বিদায়ের পর আল্লাহ সুলাইমানকে বাদশাহ ও নবী বানিয়েছিলেন। তিনি

প্রার্থনা করলেন:

"হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করুন যা
আমার পরে আরকেউ পাবেনা।" (সূরা: ৩৫)

আল্লাহ তায়ালা তাদের দোয়া করুল করেন এবং তাদেরকে এমন এক রাজত্ব
দান করেন যা অতুলনীয়। আল্লাহ তাদেরকে বাতাস নিয়ন্ত্রণ করার, জীনদের
সেবা করার এবং পশুদের ভাষা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন।

সোলায়মানের রাজ্য ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। তার প্রাসাদ সোনা, রূপা এবং
মূল্যবান জিনিস দিয়ে সজ্জিত ছিল। তারা জীনদের সাহায্যে উপাসনালয়,
খিলান, মূর্তি, বড় পাত্র এবং কড়াই তৈরি করেছিল, যেমনটি সূরা সাবাতে
উল্লেখ করা হয়েছে।

একদিন তিনি তার সেনাবাহিনী নিয়ে সফরে গেলেন। তার বাহিনীতে মানুষ,
জীব ও পাখি ছিল। পথে তারা পিংপড়ার দল দেখতে পেল। একটি পিংপড়া

বলল:

"হে পিংপড়া! তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, পাছে সোলায়মান ও তার সৈন্যদল
তোমাদের অজাতে পদদলিত করে।"(সূরা নিমাল: 18)

পিংপড়ার কথা শুনে সুলাইমান (আঃ) হাসলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায়

করলেন:

"হে আমার প্রভু! তোমার নেয়ামতের জন্য তোমার শুকরিয়া আদায় করার
শক্তি দাও।"

সোলায়মানও একজন ন্যায় বিচারক ছিলেন। একবার দুই মহিলা তার কাছে বিচার চাইতে আসেন। একজন বলল: "এই শিশুটি আমার।" আরেকজন বলল: "না, এটা আমার!" সোলায়মান বললেনঃ শিশুটিকে দুই ভাগে ভাগ কর। একজন মহিলা চুপ করে রইল, কিন্তু অন্যজন চিংকার করে বলল: "না! ওকে মারবেন না, ওকে ওই মহিলার হাতে তুলে দেবেন।" সোলায়মান তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে মহিলাটি শিশুটির জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলেন তিনিই তার আসল মা। তারা শিশুটিকে তার হাতে তুলে দেন। লোকেরা বললঃ সুলাইমান (আঃ)-কে আল্লাহ বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন।

সুলাইমান (আঃ) এর আরেকটি বিখ্যাত ঘটনা হল শিবার রাণীর সাথে। সাবা দেশে এক রাণী ছিলেন যিনি সূর্যের পূজা করতেন। শলোমন তাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন যাতে লেখা ছিলঃ

"পরম করণ্যাময়, পরম করণ্যাময় আল্লাহর নামে। আমার সামনে মাথা নত কর এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর।" (সূরা নিমাল: 30-31)

রাণী হতভম্ব হয়ে গেল। প্রথমে তিনি একটি উপহার পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু

সোলায়মান বললেনঃ

"আপনি কি আমাকে সম্পদ দিয়ে খুশি করবেন? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা উত্তম।"

অতঃপর রানী নিজেই সোলায়মানের দরবারে উপস্থিত হলেন। সোলায়মান
দৈত্যদের তার সিংহাসন আনতে বললেন। তিনি যখন প্রাসাদে প্রবেশ
করলেন, তখন তিনি একটি কাঁচের মেঝে দেখতে পেলেন যার নীচে জল দেখা
যাচ্ছে। তিনি ধরে নিলেন এটি জল, এবং বিনয়ের সাথে তার পা খুললেন।

সুলাইমান বললেন,

"এটি প্রাস"

রানী লজ্জা পেয়ে বললেন,

"আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং সোলায়মানের সাথে ইসলাম গ্রহণ করি।"

সোলায়মান (আ.) সারা জীবন আল্লাহর ইবাদত, ন্যায় ও জীতির হেদায়েতের
মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। তিনি এমন অবস্থায় মারা গেলেন যে জীন্দ্ৰিয়া তার
মৃত্যু সম্পর্কে জানত না, যতক্ষণ না তার লাঠি পড়ে যায় এবং জীন্দ্ৰিয়া জানত যে

সে মারা গেছে (সূরা সাবা: 14)।

হজরত সোলায়মান (আ.)-এর কাহিনী আমাদের শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান,
ন্যায়বিচার, কৃতজ্ঞতা ও আস্থা হচ্ছে প্রকৃত সম্পদ। তিনি ছিলেন একজন
জ্ঞানী, দয়ালু ও আল্লাহর প্রিয় নবী।



পরিত্র কুরআন: সূরা নিমাল (আয়াত 15-44), সূরা সা (আয়াত 30- 40), সূরা সাৰা (আয়াত 14)

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদীস নং 3425 •

জীবনি: ইবনে কাথির, নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 295-300 •

1. সুলায়মান (আঃ) কোন নবী ছিলেন?
2. হ্যরত সুলায়মান (আঃ) কে পশ্চ ও জ্বিনদের সাথে কথা বলার জন্য কোন বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন?
3. হ্যরত সুলায়মানের বাহিনী আসার সময় পিঁপড়া তার সম্প্রদায়কে কী বলেছিল?
4. হ্যরত সুলায়মান (আ.) দুই নারীর সন্তানের মধ্যে বগড়া-বিবাদে কিভাবে ন্যায়বিচার করলেন?
5. নবী সুলায়মান (সা.) এর প্রাসাদে শেবার রানী কী চোখের পাতা খুলেন?
6. হ্যরত সুলায়মান (আঃ) এর মৃত্যুর কথা জিনরা কিভাবে জানল?

(২৩)

❖ হজরত জাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা

বহু বছর আগে বনী ইসরাইলের একটি শহরে জাকারিয়া নামে এক নবী বাস করতেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা। জাকারিয়া বৃদ্ধ, ধৈর্যশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। তিনি বাইতুল মাকদিস নামক উপাসনালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তার গল্প আমাদের শেখায় যে আমরা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তখন তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করে দেন।

যাকারিয়ার সময়ে কিছু ইসরাইল আল্লাহর পথ হারিয়ে ফেলে। তারা পাপ কাজ করেছে এবং ঝগড়া করেছে। জাকারিয়া তাদেরকে আল্লাহর পথে ডাকতে থাকেন। তিনি উপাসনালয়ে দাঁড়িয়ে বলতেন: হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর আনুগত্য কর। তিনি আপনার সৃষ্টিকর্তা, এর জন্য তওবা করুন। তিনি গরীবদের খাওয়াতেন এবং শিশুদের কাছে সেশ্বরের গল্প শোনাতেন। মানুষ তাকে অনেক সম্মান করত।

কিছু রেওয়ায়েতে জাকারিয়ার স্তীর নাম আলিশবা বা ইলিসাবাত। তারা উভয়েই বৃদ্ধ এবং কোন সন্তান ছিল না। জাকারিয়া এমন একটি সন্তান চেয়েছিলেন যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবে। কিন্তু তিনি এবং তার স্তী বৃদ্ধ

ছিলেন। কিন্তু জাকারিয়া আল্লাহর উপর আশা ছাড়েননি। তিনি রাতে ইবাদত-
বন্দেগিতে নামাজ পড়তেন এবং দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে
একটি পুত্র দাও যে তোমার ধর্মের সেবা করবে।

একদিন জাকারিয়া সিনাগগে মরিয়ম নামে এক মেয়ের দেখাশোনা করছিলেন।
মরিয়ম খুব পবিত্র মেয়ে ছিলেন। যখন জাকারিয়া মরিয়মের ঘরে গেলেন, তিনি
দেখলেন যে তার কাছে ফল এবং খাবার রয়েছে যা মৌসুমে পাওয়া যায় না।
তিনি অবাক হয়ে বললেন, "মেরি! এই ফল কোথা থেকে এলো?" জাকারিয়া
বুঝতে পেরেছিলেন যে আল্লাহ মরিয়মকে বিশেষ সম্মান দিয়েছেন। এই ঘটনা
তাকে আরও আশার সঞ্চার করেছে। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যে,
হে আল্লাহ! তুমি অলৌকিকভাবে মরিয়মকে খাইয়েছ, আমাকেও একটি সন্তান
দাও।

এক রাতে জাকারিয়া সিনাগগে নামাজ পড়ছিলেন। হঠাৎ ফেরেশতারা
এলেন। তিনি বললেনঃ যাকারিয়া! আল্লাহ তায়ালা আপনার দোয়া করুণ
করেছেন। তোমার একটি পুত্র হবে, তার নাম হবে ইয়াহিয়া। তিনি একজন নবী
হবেন এবং মানুষকে আল্লাহর পথ দেখাবেন। জাকারিয়াস অবাক হলেন। তিনি
বললেনঃ আমি ও আমার স্ত্রী বৃদ্ধ। ফেরেশতারা বললেন, আল্লাহর জন্য সবই
সন্তুষ্ট। জাকারিয়া আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

কিছুদিন পর আলিশবা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। তার নাম ছিল ইয়াহিয়া।

ইয়াহিয়া নবী হয়ে বড় হয়েছেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন।

জাকারিয়া খুব খুশি হলেন। বাকি জীবন তিনি আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছেন।

কিন্তু তার জীবনে ঘটে গেল এক দুঃখজনক ঘটনা। ইসরায়েলের কিছু দুষ্ট

লোক তাকে তাদের শক্ত মনে করেছিল। তারা জাকারিয়াকে হত্যা করতে

চেয়েছিল। জাকারিয়া একটি গাছের পাঁড়িতে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু শক্তরা তাকে

খুঁজে পায়। তারা তাকে শহীদ করেছে।

জাকারিয়ার গল্প আমাদের আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শেখায়। তিনি

অসন্তবকে সন্তব করেন। জাকারিয়া ছিলেন একজন ধৈর্যশীল, দয়ালু এবং

আল্লাহর প্রিয় নবী। তাঁর জীবন আমাদের সুরণ করিয়ে দেয় যে আল্লাহ তাঁর

বান্দাদেরকে কখনো নিরাশ করেন না।

ইঙ্গিত:

পবিত্র কুরআন: সূরা মরিয়ম, আয়াত 2-15 •

পবিত্র কুরআন: সূরা আল ইমরান, আয়াত 38-41 •

হাদিস: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: 2378 •

জীবনী: ইবনে কাথির, নবীদের গল্ল, পৃষ্ঠা 305-310 •

1. হযরত যাকারিয়া (আ.) কোন ইবাদতের দায়িত্বে ছিলেন?
 2. হযরত যাকারিয়া (আ.) আল্লাহর কাছে কিসের দোয়া করেছিলেন?
 3. হযরত যাকারিয়া (আ.) এর স্ত্রীর নাম কি?
 4. হযরত যাকারিয়া (রাঃ) মরিয়মের কক্ষে কী দেখেছিলেন?
 5. হযরত যাকারিয়া (আ.) এর পুত্রের নাম কি?
 6. হযরত যাকারিয়া (আ.) লুকিয়ে থাকা দুষ্টদের হাতে কোথায় শহীদ হয়েছিলেন?
-

(24)

❖ হ্যরত ইয়াহইয়া (আঃ) এর সঠিক ঘটনা

বহু বছর আগে বনী ইসরাইলের একটি শহরে একজন নবীর জন্ম হয় ইয়াহইয়া
তিনি ছিলেন হ্যরত যাকারিয়ার পুত্র। ইয়াহইয়ার জন্ম একটি অলৌকিক ঘটনা
ছিল কারণ তার পিতা-মাতা জাকারিয়াস এবং তার স্ত্রী তার বয়স ছিল অনেক।
আল্লাহ তাদের দোয়া করুন এবং ইয়াহইয়াকে মঙ্গুর করেন। ইয়াহইয়ার
গল্প আমাদেরকে সত্যের জন্য লড়াই করতে এবং আল্লাহর পথে মরতে

শেখায়।

ইয়াহইয়া যখন যুবক ছিলেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও জ্ঞানী। তিনি তাঁর
পিতা যাকারিয়ার কাছ থেকে আল্লাহর পথ শিখেছিলেন। সে পূজার মন্দির
আমি গিয়ে নামাজ পড়তাম এবং আল্লাহর প্রশংসা করতাম। তার মুখ হাসছিল
এবং তাঁর হৃদয় ছিল দয়ায় পরিপূর্ণ। লোকেরা তাকে দেখে বলত ইয়াহইয়া
আল্লাহর বিশেষ বান্দা। ঈশ্বর তাকে অল্প বয়সে নবী বানিয়েছিলেন।

ইয়াহইয়ার সময় ইসরাইলদের কেউ কেউ আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। তাদের
রাজা ছিল খুবই নিষ্ঠুর। সে পাপ করেছে এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে।
ইয়াহইয়া তাদের সরল পথ দেখাতে লাগলেন। তিনি শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে

বললেন:

"হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর আনুগত্য কর। তোমাদের পাপ ত্যাগ কর এবং

তাঁর কাছে তওবা কর। তিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা।"

তার কথা সত্য ছিল। কিছু লোক তাদের কথা শুনল, কিন্তু রাজা ও তার

লোকেরা ক্ষিপ্ত হলেন।

ইয়াহিয়া সত্য বলতে ভয় পাননি। এক সময় এক রাজা তিনি তার সৎ কন্যাকে

বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, যা ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে ছিল। ইয়াহিয়া তার

বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তিনি বললেনঃ

"হে রাজা! এটা পাপ। ঈশ্বরের আনুগত্য কর।"

রাজা রেগে গেলেন। তার স্ত্রীও ইয়াহিয়ার ওপর ক্ষুঢ় কারণ সে চায়নি কেউ

রাজার বিরুদ্ধে কথা বলুক। তারা ইয়াহিয়াকে তাদের শক্ত মনে করত। রাজা

বললেনঃ

ইয়াহিয়াকে ধর। সে আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে।

ইয়াহিয়া জানতেন যে তার জীবন বিপন্ন। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেনঃ

"হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথে রাখুন।"

তিনি মানুষকে বোঝাতে থাকেন। তিনি বললেনঃ

"আল্লাহর পথ অনুসরণ কর, তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন।"

কিন্তু রাজার লোকেরা তাদের ধরে ফেলল। তারা তাকে বন্দী করে। রাজার

পরিবার ইয়াহিয়ার শাহাদাতের দাবি জানায়। রাজা তাদের সাথে একমত

হলেন। তারা ইয়াহিয়াকে শহীদ করে।

ইয়াহিয়ার শাহাদাতের পর আল্লাহ তায়ালা তার সম্প্রদায়ের উপর আযাব
পাঠিয়েছিলেন। যারা তাকে হত্যা করেছিল তারা বিধ্বস্ত হয়েছিল। ইয়াহিয়ার
জীবন সংক্ষিপ্ত হলেও তার কাজ ছিল দুর্দান্ত। তারা সত্যের জন্য প্রাণ
দিয়েছে। মানুষ তাকে স্মারণ করত এবং বলত ইয়াহিয়া ছিলেন আল্লাহর
একজন প্রকৃত নবী। আল্লাহ তাকে জামাতুল ফেরদৌসে উন্নীত করেন।

ইয়াহিয়ার গল্প আমাদেরকে সত্য কথা বলতে শেখায়, এমনকি তা বিপজ্জনক
হলেও। তিনি ছিলেন খাঁটি, সাহসী ও আল্লাহর প্রিয় নবী। তার জীবন আমাদের
মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ সর্বদা সত্যবাদীদের রক্ষা করেন, এমনকি মৃত্যুর
পরেও।

ইঙ্গিত:

পবিত্র কুরআন: সূরা মরিয়ম, আয়াত 12-15 •

পবিত্র কুরআন: সূরা ইনাম, আয়াত 85 •

হাদিস: ইবনে কাথিরের তাফসীর, সূরা মরিয়ম, আয়াত 12-15 •

জীবনী: ইবনে কাথির, নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 315-320 •

1. ইয়াহিয়ার বাবার নাম কী?
 2. আল্লাহ কবে হ্যরত ইয়াহিয়া (রাঃ) কে নবী বানিয়েছিলেন?
 3. হ্যরত ইয়াহিয়া (রাঃ) জনগণকে কী বার্তা দিয়েছিলেন?
 4. রাজা তার সৎ মেয়ের সাথে কী করতে চেয়েছিলেন?
 5. হ্যরত ইয়াহিয়া (রাঃ) বাদশাহকে কী বলেছিলেন?
 6. হ্যরত ইয়াহিয়া (আ.) কে শহীদ করেছিলেন?
-

(25)

❖ যীশুরগন্ধ

বহু বছর আগে বনী ইসরাইলের এক গ্রামে এক নবীর জন্ম হয় যীশু তিনি ছিলেন মরিয়মের পুত্র। যীশুর জন্ম একটি অলৌকিক ঘটনা কারণ তার পিতা ছিল না। ঈশ্বর তাদের অলৌকিকভাবে সৃষ্টি করেছেন। যীশুর গন্ধ আমাদের শেখায় যে ঈশ্বরের ক্ষমতার কোন সীমা নেই, এবং লোকেদের অবশ্যই তাঁর পথে ডাকতে হবে।

যীশুর মা মরিয়ম ছিলেন একজন পরিত্ব নারী। সে পূজার মন্দির আমি বেঁচে থাকতাম এবং আল্লাহর ইবাদত করতাম। একদিন জিরাইল ফেরেশতা তাঁর কাছে এলেন। তিনি বললেনঃ

"হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে একটি পুত্র দান করবেন। তার নাম হবে যীশু, এবং তিনি হবেন একজন নবী।"

মেরি অবাক হয়ে গোল। তিনি বললেনঃ

"আমার কোন স্বামী নেই।"

ফেরেশতা বললেনঃ

"আল্লাহর কাছে সবকিছুই সম্ভব। তিনি বলেন, 'হও', তাই হয়।"
মরিয়ম ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন।

যীশু তালগাছের নিচে জন্ম হয়েছিল যখন মেরি তার গ্রামে ফিরে আসেন,

লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল:

"মেরি! এই বাচ্চা কোথা থেকে এলো?"

তখন শিশু যীশু কথা বললেন। তিনি বললেনঃ

"আমি ঈশ্বরের দাস। তিনি আমাকে একজন নবী করেছেন। আমি মানুষকে

তাঁর পথ দেখাব।"

মানুষ হতবাক। তারা বিশ্বাস করত যে যীশু ঈশ্বরের বিশেষ নবী।

যীশু একজন নবী হিসাবে বেড়ে ওঠেন। ঈশ্বর তাদের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তারা কাদামাটি থেকে পাখি তৈরি করত, এবং আল্লাহর নির্দেশে তারা জীবন্ত উড়ে বেড়াত। তিনি অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ করেছিলেন এবং এমনকি মৃতদেরও জীবিত

করেছিলেন। তিনি বলতেনঃ

"এই সব আমি ঈশ্বরের আদেশে করি। তিনিই একমাত্র ঈশ্বর।"

ঈসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলতেনঃ

"হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর আনুগত্য কর। তাঁর কাছে তওবা কর।"

কিন্তু ইসরাইলদের মধ্যে কেউ কেউ ঈসা (আঃ) কে তাদের শক্ত মনে করেছিল। তিনি বলেন, যীশু একজন জাদুকর। সে আমাদের ধর্মকে ধ্বংস

করছে। তাদের নেতারা রোমান শাসকদের কাছে গিয়ে যীশুর বিরুদ্ধে
অভিযোগ করলেন। তিনি বললেনঃ
"যীশুকে হত্যা করুন।"
রোমি তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর যীশুকে রক্ষা
করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা তাদের নিজের কাছে নিয়েছিলেন。
শক্তরা ভেবেছিল তারা যীশুকে হত্যা করেছে। তবে তাদের হত্যা করা হয়নি।
যীশু নিজেই শিষ্যরা তিনি বললেনঃ মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান কর।
"আমি ফিরে আসব।"
তাঁর অনুসারীরা তাঁর আনুগত্য করে আল্লাহর দ্঵িনের প্রসার ঘটান। যীশুর গন্ত
আমাদের শেখায় যে ঈশ্বরের শক্তি সব কিছুর উপরে। তিনি ছিলেন খাঁটি,
দয়ালু এবং আল্লাহর প্রিয় নবী। কোরানে ঈসা (আঃ)-এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা
হয়েছে এবং হাদিসে তাঁর আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। তারা পৃথিবীতে
শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে।

ইঙ্গিত:

পবিত্র কুরআন: সূরা মরিয়ম, আয়াত 16-36 •

পবিত্র কুরআন: সূরা আল ইমরান, আয়াত 45-59 •

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদীস নং: 3448 •

জীবনী: ইবনে কাথির, নবীদের গল্প, পৃষ্ঠা 325-330 •

1. যিশুর মায়ের নাম কি?
 2. যিশুর জন্ম কীভাবে এক অলৌকিক ঘটনা ছিল?
 3. ছোটবেলায় লোকেরা যখন মরিয়মকে জিজেস করেছিল তখন যিশু
কী বলেছিলেন?
 4. যিশু মাটি থেকে কী করেছিলেন এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত
করেছিলেন?
 5. সর্বশক্তিমান আল্লাহ কিভাবে ঈসা (আঃ) কে শক্রদের হাত থেকে
রক্ষা করলেন?
 6. যিশু তাঁর শিষ্যদের কী আদেশ দিয়েছিলেন?
-

(26)

❖ বদরের যুদ্ধের সঠিক কাহিনী

বহু বছর আগে মদীনার নিকটবর্তী বদর নামক স্থানে এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয় যা বদর যুদ্ধ নামে পরিচিত। এটি ছিল ইসলামের প্রথম সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখলে অল্প শক্তিতেও মহান বিজয় হতে পারে।

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে কুরাইশরা মক্কার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করছিল। তারা চায়নি মুসলমানরা মদিনায় শান্তিতে বসবাস করুক। একবার কুরাইশদের একটি বড় বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে ফিরছিল। কাফেলার নেতা ছিলেন আবু সুফিয়ান, যিনি সিরিয়া থেকে পণ্ডুব্য নিয়ে মক্কায় ফিরছিলেন। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুনেছিলেন যে এই কাফেলাই ছিল কুরাইশদের অর্থনীতির প্রধান উৎস, যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি 313 জন সঙ্গী নিয়ে রওনা হলেন কনভয়কে আটকানোর

জন্য।

কিন্তু আবু সুফিয়ান এ খবর পেয়ে কাফেলার গতিপথ পরিবর্তন করেন। তিনি
মঙ্গায় বার্তা পাঠালেন। কুরাইশ মঙ্গা প্রতিশোধের চেতনায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি
প্রায় এক হাজার সৈন্য নিয়ে বদর অভিযুক্তে অগ্রসর হন। তাদের প্রধান ছিল
আবু জাহল যে মুসলমানদের নির্মূল করতে চেয়েছিল। কুরাইশরা আসছে
শুনে মুসলমানরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের ছিল মাত্র ৩১৩ জন এবং অন্ত্রে
অভাব ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন। তাঁর উপর ভরসা করুন।"

মুসলমানরা বদরে শিবির স্থাপন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন:

"হে আল্লাহ! আমাদের সাহায্য করুন। আপনি ছাড়া আমাদের আর কেউ
নেই।"

রাতে আল্লাহ মুসলমানদের গভীর ঘূম দেন যাতে তারা বিশ্বাম নিতে পারে।
সকালে শুরু হয় মারামারি। কুরাইশদের বাহিনী ছিল বিশাল, তাদের কাছে
ঘোড়া, তলোয়ার ও অস্ত্র ছিল। মুসলমানদের ছিল শুধু সাহস আর বিশ্বাস।
যুদ্ধের শুরুতে কিছু সাহাবী একাই কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করেন। হজরত
আলী (রা.), হজরত হামজা (রা.) ও হজরত ওবায়দা (রা.) বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ
করেন। অতঃপর সমগ্র বাহিনী যুদ্ধে নামে। মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য

আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ
তাদের সাহায্য করার জন্য তিন হাজার, তারপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা
পাঠিয়েছিলেন। মুসলমানরা সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছে। হ্যরত আলী ও
হ্যরত হামজা কুরাইশদের মহান যোদ্ধাদের পরাজিত করেন। আবু জাহেলও
নিহত হয়।

কুরাইশরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা জিতেছে। তাদের মধ্যে মাত্র
14 জন শহীদ হন এবং 70 জন কুরাইশ নিহত হন। মুসলিমরা কুরাইশদের
কাছ থেকে অনেক অস্ত্র ও সম্পদ পেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেনঃ

"এটা আল্লাহর বিজয়। তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন।"
বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের এক মহান বিজয়। এতে মুসলমানদের শক্তি ও ঈমান
বৃদ্ধি পায়।

বদরের যুদ্ধ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমরা যদি আল্লাহর উপর ভরসা রাখি
তাহলে সামান্য শক্তি ও মহান বিজয়ের উৎস হতে পারে। আল্লাহর রসূল
(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহর সাহসী ও প্রিয়
বান্দা ছিলেন। এই গন্ড আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর সত্ত্বের সাথে
আছেন।

 ইঙ্গিত:

পবিত্র কুরআন: সূরা আল-ইমরান, আয়াত 123-125 •

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদীস নং: 3952 •

হাদিস: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: 1763 •

জীবনী: ইবনে হিশাম, সিরাত আল-নবী, পৃষ্ঠা 250-260 •

1. বদর যুদ্ধ কোথায় এবং কখন সংঘটিত হয়েছিল?
2. মুসলমানদের নেতৃত্ব কারা দিয়েছিলেন?
3. কুরাইশদের সেনাবাহিনীর নেতা কে ছিলেন?
4. সেখানে মুসলমান কতজন ছিল এবং কতজন কুরাইশ ছিল?
5. মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ কী প্রেরণ করেছেন?
6. বদর যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছিলেন?

(27)

ষষ্ঠি রাসূলুন্নাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের ঘটনা

বহু বছর আগে, মক্কা নামক একটি শহরে রাসূল (সা.) মানুষকে আল্লাহর পথে
আহ্বান করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর শেষ নবী। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা
তার বিরুদ্ধে ছিল। তারা নবী (সাঃ) ও মুসলমানদের কষ্ট দেয়। অতঃপর
আল্লাহ রাসূলুন্নাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনায় হিজরত করার
নির্দেশ দেন। এই গল্পটি আমাদেরকে আল্লাহর পথে ত্যাগ করতে শেখায় এবং
আল্লাহ তাঁর বান্দাদের রক্ষা করেন।

মহানবী (সাঃ) মক্কায় ১৩ বছর ধরে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন।
তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত
কর, মূর্তিপূজা ত্যাগ কর। কিছু লোক তার আনুগত্য করলেও কুরাইশরা রেগে
যায়। তারা মুসলমানদের তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয় এবং তাদের
হয়রানি করে। অবশেষে কুরাইশরা নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তিনি বলেন,
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবসান হোক।

আলাই তায়ালা এই ষড়যন্ত্রের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে জানিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে মঙ্গা ছেড়ে মদীনায় যেতে বললেন। আনসার নামে পরিচিত
মদিনার লোকেরা নবীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে
বললেন, আমরা একসঙ্গে হিজরত করব। হযরত আবু বকর (রা.) খুব খুশি
হলেন। তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তোমার সাথে যাব। তারা
গোপনে পরিকল্পনা করেছিল।

কুরাইশরা যখন জানতে পারল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া
সাল্লাম) মঙ্গা ত্যাগ করেছেন, তখন তারা ক্ষুঢ় হয়ে উঠল। তিনি ঘোষণা
করেছিলেন যে মুহাম্মদকে যে ব্যক্তি বন্দী করবে তাকে পুরস্কার হিসাবে
একশত উট দেওয়া হবে। তারা নবীর খোঁজে লোক পাঠালো। রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হজরত আবু বকর মঙ্গা ছেড়ে থর নামক
গুহায় লুকিয়ে ছিলেন। একটি মাকড়সা গুহার মুখে একটি জাল তৈরি করে
এবং সেখানে একটি কবুতর ডিম পাড়ে। কুরাইশরা গুহার কাছে গেলে জাল ও
কবুতর দেখে ভেবেছিল এখানে কেউ থাকতে পারবে না। তারা ফিরে গেল।

হজরত আবু বকর (রা.) ভয় পেয়ে গেলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ
দুঃখ করবেন না, আলাই আমাদের সাথে আছেন

(দুঃখ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন) - সূরা তওবাহ,

আয়াত 40

তিন দিন গুহায় থাকার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) ও হজরত আবু বকর (রা.) মদিনার

উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তাদের নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ বিন আরিফুত।

পথিমধ্যে সারাকা বিন মালিক নামে এক ব্যক্তি তাদের দেখতে পান। তিনি

পুরষ্কারের জন্য তাদের ধরতে চাইলেন, কিন্তু তার ঘোড়ার পা মাটিতে তলিয়ে

গেল। সারাকা ভয় পেয়ে বলল: "আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি।" রাসূলুল্লাহ

সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত করুন।"

অবশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছে গেলেন।

তাকে দেখে মদীনাবাসী খুশি হলো। তিনি "তালা আল বদর আলায়না" নাত

পাঠ করেন। ছোট-বড় সবাই রাস্তায় এসে মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানায়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় মসজিদে নববী নির্মাণ

করেন। তিনি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করেন। মুসলমানরা মদীনায় শান্তিতে

বসবাস করতে শুরু করে।

পরবর্তীতে, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় অবস্থানকালে
ইসলামের শিক্ষা প্রচার করেন এবং হজ্জকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ
হিসেবে ঘোষণা করেন। এতে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

এই গল্পটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে আমরা যদি আল্লাহর পথে কুরবানী করি,
তবে তিনি মহান পুরস্কার দেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া
সাল্লাম) ছিলেন একজন সাহসী, ধৈর্যশীল এবং আল্লাহর প্রিয় রাসূল।

তথ্যসূত্র:

পরিত্র কুরআন: সূরা তওবাহ, আয়াত ৪০ •

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯০৬ •

জীবনী: ইবনে হিশাম, সিরাত আল-নবী, পৃষ্ঠা ২২৫-২৩৫ •

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বছর ইসলামকে মন্ত্রায়

আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন?

২. আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোথায়

হিজরতের নির্দেশ দিয়েছেন?

3. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কারা গিয়েছিলেন?
 4. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন?
 5. যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্দী করেছে, তাকে কুরাইশ কি সওয়াব ঘোষণা করেছে?
 6. মদিনার অধিবাসীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন নাত দিয়ে সালাম দিলেন?
-

(২৮)

খন্দকের যুদ্ধের গল্প

হিজরির পঞ্চম বছরে মদীনার চারপাশে একটি বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা খন্দকের যুদ্ধ বা গাজওয়া আহ্যাব নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন। কুরাইশরা মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য মক্কা ও তাদের সহযোগীরা এসেছিল। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে ঈশ্বরের উপর আস্থা এবং বুদ্ধিমত্তা আমাদের বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

মক্কার বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা হেরে যায়। তিনি মুসলমানদের প্রতি ক্ষুক্ষ ছিলেন। বনু নাজিরের নির্বাসিত সর্দারদের সহায়তায় তারা কুরাইশ, বনু গাতফান ও অন্যান্য গোত্রকে একত্রিত করে একটি বিশাল বাহিনী গঠন করে। তার সেনাবাহিনীতে 10,000 সৈন্য, ঘোড়া এবং অস্ত্র ছিল। তারা মদিনা আক্রমণ করতে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সংবাদ শুনলেন। তিনি তার সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। হজরত সালমান ফারসী (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমরা মদিনার চারপাশে পরিখা খনন করব। এটি শক্তকে ফাঁদে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই পরিকল্পনা পছন্দ করেছিলেন।

মুসলমানরা দিনরাত পরিশ্রম করে মদিনার চারপাশে গভীর পরিখা খনন করে।

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিখা খননেও সাহায্য করেছিলেন। তিনি সাহাবীদের সাথে গান গাইতেনঃ হে আল্লাহ! আমাদের সাহায্য করুন। পরিখা খননের সময় একটি বড় পাথর উন্মোচিত হয়। কেউ তা ভাঙতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে পাথরে আঘাত করলেন। পাথর ভেঙে গেল এবং নবী (সাৎ) বললেনঃ আমি সিরিয়া, ইয়েমেন ও পারস্য বিজয় দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গীরা খুশি হলেন।

কুরাইশরা মদিনায় এলে তারা খন্দক দেখে বিস্মিত হয়। তারা ভাবল: "এটা কী? আরবরা পরিখা তৈরি করে নার!" তারা মদিনার চারপাশে শিবির স্থাপন করে। মুসলমানদের খাবার কম হয়ে গেল। তারা ক্ষুধার্ত এবং ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ধৈর্যধর, আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। তারা রাতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন।

এক রাতে নাঈম ইবনে মাসউদ নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলেন। সম্প্রতি তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি অনুমতি দিলে আমি কুরাইশ ও বনী কুরাইয়ার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারি। নবীজি রাজি হলেন। নাঈম কুরাইশদের কাছে গিয়ে বললেন: বনি কুরাইজা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা

করবে। অতঃপর তারা বনী কুরাইয়ার কাছে গিয়ে বললঃ কুরাইশ তোমাকে
ছেড়ে পালিয়ে যাবে। তারা একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করে।

এক রাতে ঈশ্বর বড় পাঠালেন। বড় কুরাইশদের তাঁর উড়িয়ে দিয়ে তাদের
আগুন নিভিয়ে দেয়। তারা ভয় পেয়ে বললঃ "আমরা বেশিক্ষণ থাকতে পারব
না।" তারা পালিয়ে যায়। সকালে মুসলমানরা দেখলেন শক্র চলে গেছে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ আমাদের বিজয় দান
করেছেন। মুসলমানরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

খন্দকের যুদ্ধ ছিল ইসলামের এক মহান বিজয়। এতে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি
পায়। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে বুদ্ধিমত্তা এবং ঈশ্বরের উপর আস্থা
থাকলে, এমনকি সবচেয়ে বড় শক্রকেও পরাজিত করা যায়। মহানবী (সা.)
ছিলেন একজন জ্ঞানী, সাহসী এবং আল্লাহর প্রিয় রাসূল।

তথ্যসূত্র:

পরিত্র কুরআন: সূরা আহযাব, আয়াত 9-27 •

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদিস নং 4112 •

হাদিস: সহীহ মুসলিম, হাদিস নং 1807 •

জীবনী: ইবনে হিশাম, সিরাত আল-নবী, পৃ. 350-360 •

1. পরিখার যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
 2. হ্যরত সালমান ফারসী (রা.) কী পরামর্শ দিয়েছিলেন?
 3. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিখা খনন করতে গিয়ে
কী বললেন?
 4. কুরাইশদের সেনাবাহিনীতে কতজন সৈন্য ছিল?
 5. নাঞ্চ ইবনে মাসউদ কুরাইশ ও বনু কুরাইজার মধ্যে কি করেছিলেন?
 6. আল্লাহ কিভাবে শক্তকে পরাজিত করেছিলেন?
-

(29)

মঙ্গাবিজয়েরকাহিনী

হিজরির অষ্টম বর্ষে মঙ্গায় একটি মহান ঘটনা ঘটে যাকে বলা হয় মঙ্গা বিজয়।

আল্লাহর রাসূল (সা:) মুসলমানদের সাথে মঙ্গা জয় করেন। এটি ইসলামের জন্য একটি অবিস্মরণীয় বিজয় ছিল এবং আমাদের শেখায় যে আল্লাহর পথে ধৈর্য এবং অবিচলতা মহান সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

কুরাইশরা তাঁকে এবং মুসলমানদেরকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছিল বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মঙ্গা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.) মুসলমানদের সংগঠিত করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। হৃদায়বিয়ার শাস্তির পর কুরাইশরা শাস্তিচূড়ি করে, কিন্তু তাদের সহযোগী গোত্র বনু বকর মুসলমানদের আত্মীয় বনু খুয়াআহকে আক্রমণ করে এবং কুরাইশরা তাদের সাহায্য করে। এটি চুক্তির একটি স্পষ্ট লজ্জন ছিল। বনু খুয়াআহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি বললেন, মঙ্গা বিজয়ের সময় এসেছে।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশ হাজার সাহাবী নিয়ে মঙ্গার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আপনি একটি গোপন পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে কুরাইশরা সেনাবাহিনীর গতিবিধি জানতে না পারে। মুসলমানরা রাতের

আঁধারে মক্কার পাশে গোঁছে সেনাবাহিনীর বিস্তার দেখানোর জন্য পাহাড়ে
আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কুরাইশরা ভয় পেয়ে গেল। এক পর্যায়ে ইকরামা বিন
আবি জাহলের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, যাকে খালিদ বিন ওয়ালিদ
বিতাড়িত করেছিলেন।

কুরাইশের সর্দার আবু সুফিয়ান পরিস্থিতি জানতে বেরিয়ে পড়লেন। হজরত
আব্বাস (রা.) তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে নিয়ে আসেন। তিনি
(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ
"আবু সুফিয়ান! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর।"
আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন।

অতঃপর মহানবী (সাঃ) মক্কায় প্রবেশ করে ঘোষণা করলেনঃ
যে ব্যক্তি তার ঘরে থাকে সে নিরাপদ।
যে কাবা গৃহে আশ্রয় নেয় সে নিরাপদ।
আর আবু সুফিয়ানের ঘরে যা আছে তাও নিরাপদ।

মুসলমানরা শান্তিতে মক্কায় প্রবেশ করল। কুরাইশরা ভয়ে ঘরবাড়িতে লুকিয়ে
থাকে। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবার দিকে এলেন
এবং সেখানে 360টি মূর্তি ভেঙ্গে বললেনঃ

সত্য এসেছে, মিথ্যা ধৰংস হয়েছে। মিথ্যা ধৰংস হতে বাধ্য।

(সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, অবশ্যই মিথ্যা বিলীন হতে চলেছে।)

তিনি (সাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবায় সালাত আদায় করলেন।

অতঃপর তিনি মক্কাবাসীদের একত্র করে বললেনঃ

"আজ আমি তোমাদের কাউকে শাস্তির যোগ্য মনে করিনা। তোমরা সবাই
স্বাধীন।"

যারা তাকে কষ্ট দিয়েছিল তাদেরকেও তিনি (সাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষমা করেছেন। মক্কাবাসী আপনার দয়া দেখে বিস্মিত হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে মক্কাইসলামের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

মক্কা বিজয় ইসলামের অবিস্মরণীয় বিজয়। এতে মুসলমানদের শক্তি, ঐক্য ও
ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ

"আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন যিনি আমাদের এই বিজয় দিয়েছেন।"

এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে দয়া, ক্ষমা এবং ধৈর্য মানুষের হৃদয় জয় করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আল্লাহর রসূল সাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দয়ালু, ধৈর্যশীল এবং আল্লাহর প্রিয় রাসূল ছিলেন।

ইঙ্গিত:

পরিষ্কৃত কোরান: সূরা আল-ফাত, আয়াত 1-29 •

হাদীসঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং 4291 •

হাদীসঃ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 4624 •

সীরাত: ইবনে হিশাম, সিরাত আল-নবী, পৃ. 405-415 •

1. কত সালে মক্কা বিজয় হয়েছিল?
2. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতজন সাহাবী মক্কায় ভ্রমণ করেছেন?
3. কুরাইশদের নেতা আবু সুফিয়ান কী করতেন?
4. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশের সময় কী ঘোষণা করেছিলেন?
5. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাতে কয়টি মূর্তি ভাস্তন করেছেন?
6. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার লোকদের সাথে কেমন আচরণ করতেন?

(৩০)

সালাহুদ্দায়বিয়ার কাহিনী

হিজরী ষষ্ঠি বর্ষে মক্কার নিকটবর্তী হৃদায়বিয়া নামক স্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

ঘটে। হৃদায়বিয়ার সন্ধি বলা হয় নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মুসলমানদের সাথে ওমরাহ করতে মক্কায় গিয়েছিলেন, কিন্তু মক্কার কুরাইশরা

তাঁকে বাধা দেয়। এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে ধৈর্য ও শান্তির পথেই

প্রকৃত বিজয়।

মহানবী (সা.) মদীনায় মুসলমানদের সংগঠিত করেছিলেন। মহানবী (সা.)

স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি মক্কায় কাবা প্রদক্ষিণ করছেন। তিনি সাহাবীদের

বললেন, আমরা ওমরাহ করতে মক্কায় যাব। প্রায় 1400 সাহাবী আপনার

সাথে রওয়ানা হয়েছেন। তাদের কাছে যুদ্ধের কোন অস্ত্র ছিল না, শুধু

তলোয়ার (প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম হিসাবে) এবং তীর্থ্যাত্রীদের পোশাক ছিল।

তারা মক্কার নিকটবর্তী হৃদায়বিয়ায় পৌঁছান।

কুরাইশরা মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে ক্ষুঢ় হয়ে ওঠে। তিনি বলেন,

মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা মক্কায় প্রবেশ করতে পারেননি। কুরাইশ সৈন্য পাঠিয়ে

মুসলমানদের বাধা দেয়। রাসূল (সাঃ) শান্তি চেয়েছিলেন। তিনি বললেনঃ

আমরা শুধু ওমরাহ পালন করতে এসেছি, আমাদের যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা
নেই। তিনি হজরত উসমানকে কুরাইশদের কাছে দৃত হিসেবে পাঠান।
হজরত উসমান মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের কাছে বার্তা পাঠালেন যে মুসলমানরা
শান্তিতে ওমরাহ করতে চায়।

কুরাইশরা হজরত উসমানকে কিছু সময়ের জন্য বাধা দেয়। মুসলমানদের
মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে হযরত উসমানকে হত্যা করা হয়েছে। সাহাবায়ে
কেরাম খুব রাগান্বিত হলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে
বললেনঃ আমরা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ কর। সাহাবায়ে কেরাম রাসুল (সাঃ) এর
কাছে তাদের আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন। এই ঘটনা বায়ত-ই-
রিজওয়ানকোরানে বলা হয়েছে, আল্লাহ পরাক্রমশালী বলেছেন যে তিনি এই
অঙ্গীকারে সন্তুষ্ট ছিলেন।

কুরাইশরা যখন বুঝতে পারল যে মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, তখন তারা
ভীত হয়ে পড়ল। তিনি হজরত উসমানকে মৃত্তি দেন এবং সুহাইল বিন
আমরকে পুনর্মিলনের জন্য পাঠান। মহানবী (সা.) শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।
চুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে ছিল যে মুসলিমরা এ বছর ওমরাহ করবে না কিন্তু পরের
বছর ফিরে এসে ওমরাহ করবে। কেউ মক্কাথেকে মদীনায় এলে তাকে
ফিরিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু কেউ মদীনাথেকে মক্কায় গেলে তাকে ফিরিয়ে
দেওয়া হবে না।

এই চুক্তিতে সাহাবায়ে কেরাম দৃঢ়খিত হলেন। তারা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমাদের জন্য ক্ষতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ তাতে কল্যাণ রেখেছেন। ধৈর্য ধর। মুসলমানরা ওমরা না করেই মদিনায় ফিরে আসেন। পরে তিনি উপলক্ষ্মি করেন যে, এই সক্ষি ইসলামের এক বিরাট বিজয়। এটি মুসলমানদের শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচারের সুযোগ দিয়েছে। অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

হৃদায়বিয়ার সক্ষি ছিল ইসলামের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ। এই চুক্তি মঙ্গ বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন জ্ঞানী, ধৈর্যশীল এবং আল্লাহর প্রিয় রাসূল। এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে শান্তি, প্রজ্ঞা এবং ধৈর্য মহান লক্ষ্য নিয়ে যায়।

 ইঙ্গিত:

পরিত্র কুরআন: সূরা আল-ফাত, আয়াত 18-29 •

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৩১ •

হাদিস: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 1785 •

জীবনী: ইবনে হিশাম, সিরাত আল-নবী, পৃ. 325-335 •

1. হৃদাইবিয়া চুক্তি কোন সালে অনুষ্ঠিত হয়?
 2. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতজন সাহাবীকে নিয়ে
ওমরাহর জন্য গিয়েছিলেন?
 3. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসের জন্য হ্যরত
উসমান (রা.) কে প্রেরণ করেছিলেন?
 4. কোন ঘটনার পর রিজওয়ানের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল?
 5. হৃদাইবিয়া চুক্তি অনুযায়ী, এ বছর মুসলমানরা কী করতে পারেন?
 6. এই চুক্তির পর ইসলাম কী লাভ করল?
-

(৩১)

ঝাইবার আক্রমণের গল্প

হিজরী সপ্তম সনে মদীনার নিকটবর্তী খাইবার নামক স্থানে এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয় খাইবার আক্রমণ বলা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। খাইবারের ইহুদিদের মধ্যে কিছু দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, বিশেষ করে যারা বনু নাজিরের অঙ্গরুক্ত। খন্দকের যুদ্ধে তিনি কুরাইশদের সাহায্য করেছিলেন। এই গল্পটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে আল্লাহর পথে সাহস এবং বিশ্বাস মহান বিজয়ের দিকে নিয়ে যায়।

খাইবার একটি উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল। ইহুদিরা সেখানে শক্তিশালী দুর্গে বাস করত। রাসুল (সাঃ) জানতেন যে খাইবারের ইহুদীরা মুসলমানদের জন্য প্রায় 1400 সঙ্গী তিনি খাইবারের উদ্দেশ্যে হৃত্যুক্তি হতে পারে। আপনি রওয়ানা হলেন।

মুসলমানরা রাতে খাইবারে পৌঁছে গোপনে শিবির স্থাপন করে। খায়বারের ইহুদীরা জানতো না যে মুসলমানরা আসছে। সকালে তারা মাঠে কাজ করতে এসে মুসলমানদের দেখে ভয় পেয়ে সাথে সাথে দূর্গে লুকিয়ে পড়ে। খাইবারে

বেশ কয়েকটি দুর্গ ছিল, যেগুলো খুবই শক্তিশালী ছিল। মুসলমানরা একের পর

এক দুর্গ আক্রমণ করলেও দুর্গ জয় করা সহজ ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুর্গ আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়ার

জন্য প্রতিদিন একজন সঙ্গী নির্বাচন করতেন। হজরত আবু বকর (রা.) ও

হজরত ওমর (রা.) চেষ্টা করেও দুর্গ জয় করতে পারেননি। এক রাতে

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

"আগামীকাল আমি পতাকা তাকে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে

এবং আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করবেন।"

কে এই বরকত পাবে তা নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম ব্যাকুল ছিলেন। সকালে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আলীকে ডাকলেন। তার
চোখ ব্যাথা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার লালা
পোড়া তাদের চোখে লাগানো এবং প্রার্থনা, যা তাদের চোখ অবিলম্বে নিরাময়।

হ্যরত আলী (রা.) পতাকা নিয়ে দুর্গের দিকে অগ্রসর হলেন। খাইবারের

সবচেয়ে বিখ্যাত যোদ্ধা স্বাগত তাদের চ্যালেঞ্জ করেছে। মারহাব তার

স্বাভাবিক কবিতা আবৃত্তি করলেন, হ্যরত আলীও জবাবে কবিতা আবৃত্তি

করলেন এবং তারপর এক আঘাতে মারহাবকে হত্যা করলেন। মুসলমানরা

"আল্লাহ আকবর" বলে স্নোগান দেয় এবং একের পর এক দুর্গ জয় করে।

অবশেষে খাইবারের ইহুদীরা শান্তি চায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে চুক্তি করেছিলেন যে তারা খাইবারে থাকতে পারবে,
তবে কেবল তাদের ফসলের জন্য। অর্ধেক অংশ মুসলমানদের দেবে।
মুসলমানরা প্রচুর লুঠন, অন্তর্মন্ত্র ও সম্পদ পেয়েছিল। আল্লাহর রসূল
(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং
বললেন, এটা আল্লাহর বিজয়, যিনি আমাদের শক্তি দিয়েছেন।

পূর্ববর্তী

খাইবারের যুদ্ধ আমাদের সেই শিক্ষা দেয় সাহস, বিশ্বাস এবং আল্লাহর উপর
ভরসা এমনকি সবচেয়ে বড় শক্তিকেও পরাজিত করা যায়। আল্লাহর রসূল
(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাথীরা ছিলেন আল্লাহর সাহসী ও
প্রিয় বান্দা, যারা ইসলামের দ্বীনের উচ্চারণের জন্য প্রতিটি ত্যাগ স্বীকার
করেছিলেন।

তথ্যসূত্র

পবিত্র কুরআন: সূরা ফাতাহ, আয়াত 20 •

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদিস নং 4209-4210 •

হাদিস: সহীহ মুসলিম, হাদিস নং 1809 •

জীবনী: ইবনে হিশাম, সিরাত আল-নবী, পৃ. 365-375 •

1. খাইবারের যুদ্ধ কোন সালে সংঘটিত হয়?
2. খাইবারের লোকেরা কোন ধরনের দুর্গে বাস করত?
3. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সাহাবীকে পতাকা দান করেছিলেন?
4. হযরত আলী (রা.) খয়বারের কোন যোদ্ধাকে পরাজিত করেছিলেন?
5. হযরত আলীর চোখে যে যন্ত্রণা ছিল তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নিরাময় করলেন?
6. খাইবারের ইন্দিরা শাস্তির পর মুসলমানদের কী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল?

✿ হজ্জ আল-ওয়াদার গল্প(৩২)

দশম হিজরীতে মক্কায় এক মহা ঘটনা ঘটে বিদায় হজ বা বিদায় হজ বলা হয়,

এটি ~~প্রাচীন~~ মহানবী (সা.) এই হজে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই আপনি ছিল তার জীবনের শেষ হজ। এই গল্প আমাদের আল্লাহর পথে বাঁচতে এবং মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে শেখায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করেন। ইসলাম আরবের মুসলমানদের জানান যে তারা এ ~~বহু~~ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আপনি

বছর হজ করবেন। তিনি বললেনঃ আমার সাথে যোগ দাও।

প্রায় এক লাখ চবিশ হাজার মুসলমানরা মক্কায় সমবেত হয়। তারা মদিনা, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং আরবের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এসেছিল। সবাই হাজীদের পোশাক পরে 'লাবিক আল্লাহম লাবিক' বলে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছে যান।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বা প্রদক্ষিণ করলেন, সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঁজ করলেন। এরপর তিনি আরাফাতের ময়দানে নিমরার উটে চড়ে খুতবা প্রদান করেন ~~স্থানে~~ অবস্থান করেন। সেখানে আপনি "কাসওয়া"। এই উপদেশ বিদায়ী বার্তা বলা হয়।

তিনি (সাল্লাহু'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

"হে লোকসকল! তোমরা সবাই সমান। একজন আরবের উপর একজন

বিদেশীর উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তাকওয়া ছাড়া।

নারীদের প্রতি সদয় হও, কেননা তুমি তাদেরকে আল্লাহর শান্তিতে পেয়েছ।

মানুষের জান-মালকে ভরসা মনে কর, রক্ষা কর।

আমি তোমাদের মাঝে কুরআন ও সুন্নাহ রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা সেগুলো

অনুসরণ কর তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।"

লোকেরা যখন এই কথাগুলি শুনল, তখন তাদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে

পড়ল। তারা জানতেন এটাই ছিল আল্লাহর রাসূলের শেষ বাণী। একই দিনে

আল্লাহ পরিত্র কোরআনের মহান আয়াতটি নাজিল করেন:

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের

প্রতি আমার অন্তর্গত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন

হিসেবে গ্রহণ করলাম।

(সূরা মায়েদা, আয়াত ৩)

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের

প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে

গ্রহণযোগ্য করে দিলাম।"

আরাফাতের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিনা সফর
দ্বারা জামরাতে নুড়ি নিষ্কেপ করা, বলিদান, এবং ~~করেন~~ করেন। সেখানে আপনি
হজের যাবতীয় হৃকুম পালন করতেন এবং সাহাবায়ে কেরাম ~~গলা~~ আপনি
তাঁর কাছ থেকে হজের পদ্ধতি শিখেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ফিরে আসেন এবং সুন্নত তিনি
অর্থ প্রদান করেছেন। তারপর তারা মদিনায় ফিরে আসেন।

বিদ্যায়বার্তা

বিদ্যায় হজ ইসলামের জন্য একটি মহান ঘটনা ছিল। নবী (সা.) এই উপলক্ষে
মুসলমানদেরকে কীভাবে বাঁচতে হবে তা শিখিয়েছেন। কয়েক মাস পর তুমি
সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এই গল্প আমাদের শেখায় যে আমরা ~~করে~~
আল্লাহর পথে জীবন যাপন করা হয়, এবং মানুষের প্রতি ন্যায়, করণ ও
ভালোবাসা সঙ্গে মোকাবিলা করা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া
সাল্লাম) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, জ্ঞানী ও আল্লাহর প্রিয় রাসূল।

তথ্যসূত্র

পরিত্র কুরআন: সূরা মায়েদা, আয়াত ৩ •

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদিস নং 4406 •

হাদিস: সহীহ মুসলিম, হাদিস নং 1218 •

জীবনী: ইবনে হিশাম, সিরাত আল-নবী, পৃ. 450-460 •

1. বিদায়ী তীর্থ্যাত্মা কোন সালে অনুষ্ঠিত হয়?
 2. হজের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মুহূর্তে
খুতবা দিলেন?
 3. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিদায়ী খুতবায় সকল
মানুষকে সমান ঘোষণা করেছেন?
 4. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের ব্যাপারে কি
উপদেশ দিলেন?
 5. বিদায়ী তীর্থ্যাত্মার দিন কোন মহৎ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল?
 6. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কি হজের আমল
করেছিলেন?
-

(৩৩)

✿ নবীজীর মৃত্যুর কাহিনী

হিজরীর একাদশ সনে মদিনায় এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাৎ) আল্লাহর শেষ রাসূল এই পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। এই গম্ভীর আমাদের শিক্ষা দেয় যে নবী (সাৎ) এর শিক্ষা আমাদের সর্বদা পথ দেখায়, যদিও তিনি আমাদের মধ্যে না থাকেন।

মহানবী (সা.) মঙ্গা জয় করেন, হজ আল-উইদা করেন এবং আরবের অনেক মুসলমানদের শিখিয়েছেন কিভাবে অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। আপনি অসুস্থ আল্লাহর পথে চলতে হয়। কিন্তু দশম হিজরির শেষ দিকে আপনি ডার প্রচন্ড জ্বর ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মসজিদে হয়ে পড়েন। আপনি নবীতে যেতেন এবং নামাজ পড়তেন।

একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতটাই অসুস্থ হয়ে তিনি হজরত আবু গড়লেন যে তিনি মসজিদে যেতে পারলেন না। আপনি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, লোকদের নামায়ের ইমামতি কর। সাহাবায়ে কেরাম বুকতে পারলেন নবীজির স্বাস্থ্য খুবই খারাপ। তারা

জন্য দোয়া করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লিম আপনাকে
সাল্লাম) আয়েশার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের পরামর্শ: আপনি

"হে আমার সাহাবীগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি
আঁকড়ে ধর এবং একে অপরের প্রতি দয়া কর।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসুস্থতা বেড়ে যায়। সোমবার
তিনি হ্যরত আয়েশার কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, আপনি
তিনি হাসলেন। হজরত আয়েশা (রা.) বললেন, নিচ্ছিলেন। হঠাতে তুমি
ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কী দেখছেন?

বলেছেন: তারপর আপনি

"হে আল্লাহ, সর্বোচ্চ সঙ্গী!"

"হে আল্লাহ! আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গী দান করুন।"

বরখাস্ত মহানবী (সা.) ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এই কথা বলে তুমি
মহানবী (সা.) ইন্দ্রিয়কাল করেছেন মদীনায় খবর ছড়িয়ে পড়লে সাহাবায়ে
কেরামের ওপর শোকের পাহাড় নেমে আসে। তারা এটা বিশ্বাস করতে

পারেনি। হজরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মারা যাননি, তিনি ফিরে
আসবেন।

তখন হজরত আবু বকর মসজিদে এসে বললেন,
"হে মুসলমান! যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপাসনা
করত, সে জেনে রেখো যে সে মারা গেছে। আর যে আল্লাহর ইবাদত করে,
আল্লাহ চিরজীবি, কখনো মৃত্যুবরণ করেন না।"

তখন হজরত আবু বকর (রা.) কোরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন:
"মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছু নন, তার আগেও অন্যান্য রাসূল চলে
গেছেন..."
(সূরা আল ইমরান, আয়াত 144)
"মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজনই রসূল, তাঁর পূর্বে বহু
রসূল গত হয়েছেন।

এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম শান্ত হলেন এবং সত্যকে মেনে নিলেন।
মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু মুসলমানদের জন্য ছিল এক বিরাট ধাক্কা। কিন্তু তুমি
আমার মনে পড়ল তিনি কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতে থাকলেন।

নবীকে হয়রত আয়েশার কক্ষে দাফন করা হয়েছিল, যেটি এখন মসজিদুল
হারামের অংশ।

পূর্ববর্তী

এই গল্পটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে নবী (সাৎ) এর জীবন আমাদের জন্য
আলোর বাতিঘর। তিনি ছিলেন একজন দয়ালু, জ্ঞানী এবং আল্লাহর প্রিয়
রাসূল। তাঁর শিক্ষা আজও আমাদের হৃদয়কে বাঁচিয়ে রাখে এবং আমাদেরকে
আল্লাহর পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে।

তথ্যসূত্র

পরিত্র কুরআন: সূরা আল-ইমরান, আয়াত 144 •

হাদিস: সহীহ বুখারী, হাদীস নং 8862–8863 •

হাদিস: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 2296 •

জীবনী: ইবনে হিশাম, সিরাত আল-নবী, পৃ. 465-475 •

1. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সালে পৃথিবী ত্যাগ করেন?
 2. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতার সময় কোন সাহাবীকে নামায ইমামত করার জন্য নির্দেশ করেছিলেন?
 3. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ মুহূর্তে কী নামায আদায় করলেন?
 4. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার কক্ষে মৃত্যুবরণ করেন?
 5. হযরত আবু বকর (রাঃ) সাহাবীগণকে কোন আয়াত পাঠ করেছিলেন?
 6. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোথায় দাফন করা হয়েছিল?
-

(34)

❖ হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খেলাফতের ঘটনা

নবীজির ইস্তেকালের পর মদীনায় মুসলমানদের জন্য কঠিন সময় ছিল। হজরত আবু বকর সিদ্দিক ইসলামের প্রথম খলিফা হন। তিনি ছিলেন নবীজির সবচেয়ে কাছের বন্ধু ও প্রিয় সাহাবী। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে আমাদের কঠিন সময়েও সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইস্তেকালের পর মুসলমানরা গভীরভাবে শোকাহত। কিছু লোক মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে নবী (সাৎ) এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। কিছু গোত্র ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং বলেছিল যে আমরা আর যাকাত দেব না। মদীনার বাহিরের কিছু লোক নিজেদেরকে নবী বলে ঘোষণা করেছিল। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে মুসলমানরা একজন নেতাকে বেছে নেয়। হযরত আবু বকরকে খলিফা করা হয়েছিল কারণ তিনি ছিলেন নবীর প্রিয় সাহাবী এবং ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

হজরত আবু বকর মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন,

"আমি তোমাদের উপর খলিফা নিযুক্ত হয়েছি, যদিও আমি তোমাদের মধ্যে
সর্বোত্তম নই। আমি যদি সঠিক কাজ করি তবে আমাকে সাহায্য করুন এবং
যদি আমি ভুল করি তবে আমাকে সংশোধন করুন। আমি কুরআন ও সুনাহ

অনুসরণ করব।"

তিনি প্রথমে সেই সব গোত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন যারা যাকাত দিতে অঙ্গীকার
করছিল। হজরত ওমর শুরুতেই আপত্তি করলেন যে, আমরা মুসলমানদের
বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করব? কিন্তু হজরত আবু বকর বললেন,

"যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি অবশ্যই তার সাথে
যুদ্ধ করব।"

এরপর হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাবাহিনীসহ পাঠানো হয়। এই
যুদ্ধগুলিকে "ধর্মত্যাগের যুদ্ধ" বলা হয়। মুসলমানরা এসব প্রলোভন কাটিয়ে
উঠল।

হজরত আবু বকরের খেলাফতকালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল
কোরানের সম্পাদনা। বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অনেক হাফিজ শহীদ হন।
হজরত ওমর কোরানকে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করার পরামর্শ দেন। হযরত
আবু বকর রাঃ জায়েদ বিন সাবিত রাঃ কে এই কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।
যায়েদ এবং অন্যান্য সাহায্যিগণ কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করেন, হাফিজের
মৌখিক সূতি এবং লিখিত আয়াত একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ মুসলাফ প্রস্তুত

করেন। এই মুসহাফটি পরবর্তীতে হজরত উসমানের শাসনামলে কপি করা হয়েছিল এবং আজ আমাদের কাছে যে কোরআন রয়েছে তা এই সম্পাদনার
উপর ভিত্তি করে।

হজরত আবু বকরের সময় মুসলমানরা পারস্য ও রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। হ্যারত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ ইরাকের অনেক এলাকা জয় করেন।
মুসলিমরা সিরিয়ায় রোমানদের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধ করেছে।

হজরত আবু বকরের খেলাফত প্রায় দুই বছর তিন মাস স্থায়ী হয়। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি হজরত ওমরকে খলিফা মনোনীত করেন এবং মুসলমানরা তাঁর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন।

হজরত আবু বকর মদ্দিনায় ইস্তেকাল করেন এবং মসজিদে নববীতে নবীজির পাশে দাফন করা হয়। তাঁর খিলাফত ইসলামের একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করেছিল। তিনি ছিলেন মহানবীর একজন দয়ালু, সত্যবাদী ও প্রিয় সাহবী।
এই গল্পটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে নেতৃত্ব মানে আল্লাহর পথে সত্যের জন্য লড়াই করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং উম্মাহকে নেতৃত্ব দেওয়া।

তথ্যসূত্র:

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২০২ •

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: 2387 •

তাফসির ইবনে কাছীর, সূরা আল ইমরান, আয়াত 144 •

তারিখ আল-তাবারী, তারিখ আল-উম আল-মুলক, ভলিউম 3, পৃ. •

210-220

1. হ্যরতআবুবকরসিদ্দিকরা(রাঃ) কতজনখলিফাছিলেন?
2. হ্যরতআবুবকররা(রাঃ) কেকেনখলিফাকরাহলো?
3. যারাযাকাতদেয়নিতাদেরবিরুদ্ধেহ্যরতআবুবকররাকী
বলেছেন?
4. হ্যরতআবুবকররা(রাঃ) লিখিতআকারেকুরআনসংকলনের
জন্যকোনসাহাযীনিয়োগকরেছিলেন?
5. হ্যরতআবুবকরেরখিলাফতকতদিনস্থায়ীহয়েছিল?
6. হ্যরতআবুবকররা(রাঃ) কেকোথায়দাফনকরাহয়?

(35)

❖ হজরত ওমর ফারুক রা.-এর
খেলাফতের কাহিনী

হজরত আবু বকরের মৃত্যুর পর হজরত ওমর ফারুক মদিনায় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হন। তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর এবং অত্যন্ত ন্যায্য বিচারক। তাঁর খিলাফতকালে ইসলাম সুদূরপ্রসারী ছড়িয়ে পড়েছিল। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে আমাদের সর্বদা ন্যায় ও সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত।

হজরত আবু বকর হজরত উমরকে খলিফা হওয়ার জন্য অসিয়ত করেন।

হযরত ওমর মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন,

"আমি তোমাদের উপর খলিফা নিযুক্ত হয়েছি। যদি আমি সৎ কাজ করি তবে আমাকে সাহায্য করুন এবং যদি আমি ভুল করি তবে আমাকে সংশোধন করুন।"

তিনি নিজেকে "আমির আল-মুমিনীন" বলেছেন, যার অর্থ "বিশ্বাসীদের প্রধান"। তার শাসনামলে মুসলিমরা পারস্য, রোম ও মিশরের বিরুদ্ধে বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ ছিল হ্যরত ওমরের খেলাফতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।
রোমানরা সিরিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনী পাঠায়। হ্যরত খালিদ
বিন ওয়ালিদ ও অন্যান্য সেনাপতিরা সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন।
মুসলমানরা জয়ী হয় এবং সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা ইসলামের অধীনে
আসে। আরেকটি বড় যুদ্ধ ছিল "কাদিসিয়ার যুদ্ধ"। হ্যরত সাদ বিন আবি
ওয়াক্স বিশাল পারস্য বাহিনীকে পরাজিত করেন। এরপর মুসলমানরা
পারস্যের রাজধানী 'মাদাইন' জয় করে।

হ্যরত ওমর খুবই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি রাতের বেলা মদীনার রাঙ্গায় ঘুরে
বেড়াতেন কেউ কষ্ট পাচ্ছে কিনা। একবার তিনি এক দরিদ্র মহিলার বাড়িতে
গেলেন। মহিলার খাওয়ার কিছু ছিল না। হজরত উমর (রা.) স্বয়ং আটা ও
খাবার নিয়ে আসেন এবং তার জন্য রান্না করেন। লোকেরা তাকে তার
ন্যায়বিচারের জন্য "ফারুক" বলে ডাকে, যার অর্থ "সঠিক ও অন্যায়ের
বৈষম্যকারী"।

হজরত ওমর অনেক নতুন সংস্কার করেন। হিজরি সন শুরু করেন।
মুসলমানদের শহরে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। সেনাবাহিনীর জন্য একটি

নিয়মিত ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। যাকাতের অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে
বিতরণ করা হয়েছিল। তার শাসনামলে মুসলিম রাষ্ট্র অত্যন্ত শক্তিশালী ও
সংগঠিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু হজরত ওমরের জীবনের শেষটা ছিল করুণ। আবু লুলু ফিরোজ নামে
একজন জাদুকর ক্রীতদাস ব্যক্তিগত আক্রেশ বা ঘড়্যপ্তের বশবর্তী হয়ে তাকে
আক্রমণ করে। একদিন সকালে হজরত উমর যখন মসজিদে নামাজ
পড়ছিলেন, তখন আবু লুলু ছুরি দিয়ে তাকে আক্রমণ করেন। হযরত উমর
(রাঃ) মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কয়েকদিন পর তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে
তিনি বলেছিলেন:

"আমার শাহাদাত যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তবে তা আমার জন্য
আনন্দের উৎস।"

তাঁকে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও হজরত আবু বকরের পাশে দাফন করা হয়। হযরত
ওমরের খেলাফত ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। তিনি ছিলেন সাহসী, ন্যায়পরায়ণ
এবং মহানবী (সা.)-এর প্রিয় সাহবী। এই গল্প আমাদের সত্য, ন্যায় এবং
মানবজাতির সেবা শেখায়.



তথ্যসূত্র:

সহীহ বুখারী, হাদীস নং: 3700 •

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: 2385 •

তারিখ আল-তাবারী, তারিখ আল-উম আল-মালুক, ভলিউম 4, পৃ. •

180-195

ইবনে কাথির, আল-বাদিয়াহ এবং আল-নাহিয়াহ, ভলিউম 7, পৃ. •

150-165

1. হ্যরত উমর রা কতজন খলিফা ছিলেন?
 2. হ্যরত উমর (রাঃ) কে 'ফারুক' বলা হলো কেন?
 3. হ্যরত উমররা (রাঃ) কেন হিজরি বর্ষ শুরু করেন?
 4. ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানরা কোন জাতিকে পরাজিত করেছিল?
 5. হ্যরত উমররা রাতে মদিনার রাস্তায় কী করতেন?
 6. হ্যরত উমররা (রাঃ) কে আহত করেন?
-

(36)

হজরত উসমান(রা.)

উমর ফারঢ়কের শাহাদাতের পর উসমান গনি মদিনায় ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন মহানবীর ঘনিষ্ঠ সহচর ও জামাতা। ইসলাম তার খেলাফতের সময় আরও ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু পার্থক্য দেখা দেয়। এই গল্ল আমাদের কঠিন সময়ে ধৈর্য এবং দয়া বজায় রাখতে শেখায়।

মৃত্যুর আগে হযরত উমর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয়জন জলিল-উল-কদর সাহাবীকে নিযুক্ত করেন। তিনি হজরত উসমানকে খলিফা করেন।

উসমান মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন:

"আমি কোরান ও সুন্নাহ অনুসরণ করব, আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও উদার ছিলেন। লোকেরা তাকে "ধৰ্মী" বলে ডাকত, কারণ তিনি দরিদ্রদের প্রচুর সাহায্য করেছিলেন।

হজরত উসমানের খিলাফতকালে মুসলমানরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করে। ইসলামী নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাইপ্রাস ও অন্যান্য দ্বীপ সমুদ্রপথে জয় করা হয়। উত্তর আফ্রিকা এবং পারস্যের আরও কিছু অংশ

ইসলামের অধীনে আসে। সিরিয়ায় হ্যরত মুয়াবিয়া এবং মিসরে হ্যরত আমর
বিন আস।

হজরত উসমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল পবিত্র কোরআনের একটি প্রমিত
সংস্করণ সংকলন করা। হজরত আবু বকর (রা.)-এর সময়ে কোরআন
সংকলিত হলেও বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ একে একে বিভিন্ন উপভাষায়
তেলাওয়াত করতেন, যার কারণে ভুল হওয়ার আশঙ্কা ছিল। হজরত উসমান
(রা.) হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীদের সঙ্গে
কুরআনের একটি মানসম্মত মুসহাফ প্রস্তুত করেন এবং মদীনা, মক্কা, কুফা ও
দামেক্ষে কপি পাঠান। আজও আমরা একই মুশাফ-ই-ওসমানী পড়ি।

খিলাফতের শেষ ঘুগে কিছু লোক অভিযোগ করে যে, হজরত উসমান রা:
তার আত্মীয়দের উচ্চ পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। যদিও এই অভিযোগগুলি
সত্য ছিল না, মিশর ও ইরাকের বিদ্রোহীরা মদীনায় হ্যরত উসমানের বাড়ি
ঘেরাও করে এবং তাকে খেলাফতের পদ থেকে পদত্যাগ করার দাবি জানায়।

হজরত উসমান রা.

"আল্লাহ আমাকে খলিফা করেছেন, আমি এই পদ ছাড়ব না।"

একদিন হজরত উসমান যখন কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, তখন
বিদ্রোহীরা তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে শহীদ করে। তার রক্ত পবিত্র কুরআনের

উপর পড়ল এবং মদীনাবাসীরা শোক প্রকাশ করল। হ্যরত উসমানকে মদীনার

জাগ্রাত আল-বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

হ্জরত উসমানের খেলাফত ইসলামের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর
জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় সত্ত্বেও লক্ষ্য ধার্মিকতা, আন্তরিকতা ও ধৈর্যের
সাথে, যত কঠিনই হোক নাকেন।

সঠিক ইঙ্গিত (রেফারেন্স)

আহাদিসঃ

সহীহ বুখারী: হাদীস নং 3698 •

(হ্যরত উসমানের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার শাহাদাতে বর্ণিত)

সহীহ মুসলিম: হাদীস নং 2403 •

তাদের প্রতি তার (হ্যরত উসমান ও আল্লাহর রাসূলের বিনয়
ভালবাসার উপর ভিত্তি করে ঐতিহ্য) /

বইয়ের ইতিহাস:

তাবারীর ইতিহাস - উম্মাহ ও রাজাদের ইতিহাস •

চামড়া 5, পৃ 150-165

(হযরত উসমানের খেলাফত, বিজয়, কোরআনের সম্পাদনা ও
শাহাদাতের বিবরণ)

শুরু এবং শেষ - ইবনে কাসির রহ •

চামড়া 7, পৃ 180-195

(হযরত উসমানের খেলাফত ও শাহাদাতের ঘটনা)

খলিফাদের ইতিহাস - আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুক্তী রহ •

পাতা 231-233

(হযরত উসমানের উপাধি, বংশ, ইসলাম গ্রহণ এবং খেলাফতের
উল্লেখ)

আল-ইসতিয়াব ফী মারিফাত আল-সাহাবা - ইবনে আবদ আল বার
রহ •

চামড়া 3, পৃ 155

(হযরত উসমানের প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা)

ଆଲ-ଆସାବା ଫୀ ତମିଜ ସାହାବା - ଇବନେ ହାଜାର ଆଶକଳାନୀ ରହ •

ଚାମଡ଼ା 4, ପୃଷ୍ଠା 377

(ହ୍ୟରତ ଉସମାନର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେର ସଟନା)

1. ହ୍ୟରତ ଉସମାନରା ଇସଲାମେର କତଜନ ଖଲିଫା ଛିଲେନ?
2. ହ୍ୟରତ ଉସମାନରାହକେ କେନ 'ଗନି' ବଲା ହତୋ?
3. ହ୍ୟରତ ଉସମାନରା ପବିତ୍ର କୁରାଅନେର ଜନ୍ୟ କୋନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଜ
କରେଛିଲେନ?
4. ହ୍ୟରତ ଉସମାନରାର ରାଜତ୍ୱକାଳେ ଇସଲାମୀ ନୌବାହିନୀ କୋନ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ
କରେଛିଲ?
5. ବିଦ୍ରୋହୀରା ହ୍ୟରତ ଉସମାନରାର କାହେ କୀ ଦାବି କରେଛିଲ?
6. ହ୍ୟରତ ଉସମାନରା (ରାଃ) କେ କୋଥାଯ ଦାଫନ କରା ହୟ?

(37)

হ্যরত আলী মুর্তজার খেলাফত ও শাহাদাত

হ্যরত উসমানের শাহাদাতের পর আলী বিন আবি তালিব মদিনায় ইসলামের চতুর্থ খলিফা হন। তিনি ছিলেন নবী মুহাম্মদের চাচাতো ভাই, জামাতা এবং অত্যন্ত সাহসী সহচর। তার খিলাফতকালে অনেক বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি ন্যায়ের জন্য লড়াই করেছিলেন। এই গল্প আমাদের সত্যের পথে চলতে শেখায়।

হ্যরত উসমানের মৃত্যুর পর মদিনায় বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা হ্যরত আলীকে খলিফা করার দাবি জানায়। আলী প্রথমে রাজি হননি, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনি ছাড়া মুসলমানদের কেউ এক করতে পারবেনা। আলী মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন যে আমি খলিফা হয়েছি, আমি ন্যায় ও কুরআনের পথ অনুসরণ করব। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও সাহসী ছিলেন। লোকেরা তাকে "মুর্তজা" বলে ডাকত, যার অর্থ "আল্লাহর প্রিয়"।

আলীর খেলাফতের শুরুতে সমস্যা ছিল। হ্যরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কিছু সাহাবী ভিন্নমত পোষণ করেন। হ্যরত আয়েশা,

হজরত তালহা ও হজরত যুবায়ের বলেন, বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে হবে।

হযরত আলী বললেন, মুসলমানদের আগে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তারপর ন্যায়বিচার হবে। এই পার্থক্য জামালের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। হযরত আলী এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং হযরত আয়েশাকে সম্মান ও সম্মানের সাথে মদিনায় ফেরত পাঠান।

আরেকটি বড় সমস্যা ছিল হযরত মুয়াবিয়ার সাথে। মুয়াবিয়া ছিলেন সিরিয়ার গভর্নর এবং হযরত উসমানের আত্মীয়। তিনি বলেন, উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি আলীর খিলাফত মেনে নেবনা। এই মতান্তেক্ষের কারণে সাফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের সময় মুয়াবিয়ার বাহিনী বর্ণায় কুরআন উঁচিয়েছিল। হযরত আলী যুদ্ধ বন্ধ করে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হন। কিন্তু কিছু মানুষ এই চুক্তি মেনে নেয়নি। তারা আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং নিজেদের খাওয়ারিজ বলে অভিহিত করেছিল।

হযরত আলী নেহরুওয়ানের যুদ্ধে খাওয়ারিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং বিজয়ী হন। কিন্তু এই বিশ্বঙ্গলা মুসলমানদের দুর্বল করে দেয়। হযরত আলী তার রাজধানী কুফায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছু লোক তার বিরুদ্ধে ঘড়্যস্ত্র করেছিল। আবদ আল-রহমান বিন মুলজুম নামে এক বিদেশী আলীর উপর ক্ষুদ্র হন। একদিন সকালে হযরত আলী যখন কুফার মসজিদে নামায পড়তে যাচ্ছিলেন, তখন

আব্দুর রহমান বিষ মাখানো ছোরা দিয়ে তাকে আক্রমণ করেন। হ্যরত আলী
আহত হয়ে পৃথিবীতে আসেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহর কসম, আমি সফল
হয়েছি। কয়েকদিন পর তিনি শহীদ হন।

হ্যরত আলীর খেলাফত ছিল কঠিন সময়। তিনি ছিলেন একজন সাহসী, জ্ঞানী
এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রিয় সাহাবী। তার জীবন
পথ কঠিন হলেও ন্যায়ের জন্য লড়াই করতে শেখায়।

 ইঙ্গিত (রেফারেন্স)

আহাদিসঃ

সহীহ বুখারী: হাদীস নং 3701 •

(হ্যরত আলীর গুণবলী এবং তাঁর জ্ঞান ও বীরত্ব সম্পর্কিত
রেওয়ায়েত)

সহীহ মুসলিম: হাদীস নং 2406 •

তাদের প্রতি~~ক্ষণ~~ (হ্যরত আলী ও আল্লাহর রাসূলের স্থান ও মর্যাদা
তার ভালবাসার উপর ভিত্তি করে ঐতিহ্য)।

বইয়ের ইতিহাস:

তাবারীর ইতিহাস - উস্মাহ ও রাজাদের ইতিহাস •

চামড়া 6, পৃ 100-120

(হযরত আলীর খেলাফত, জামালের যুদ্ধ, সাফিনের যুদ্ধ এবং
নাহরওয়ানের বিশদ বিবরণ)

শুরু এবং শেষ - ইবনে কাসির রহ •

চামড়া 8, পৃ 10-25

(হযরত আলীর খেলাফত, প্রথম ফিতনা ও শাহাদাতের ঘটনা)

খলিফাদের ইতিহাস - জালালউদ্দিন সিয়ুতি •

পাতা 169-176

(হযরত আলীর বংশ, উপাধি, খেলাফত ও শাহাদাতের উল্লেখ)

আল-ইসতিয়াব ফী মারিফাত আল-সাহাবা - ইবনে আবদ আল বার •

রহ

চামড়া 3, পৃ 35-45

(হযরত আলীর প্রাথমিক জীবন, ইসলাম গ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্জন)

আল-আসাবা ফী তমিজ সাহাবা - ইবনে হাজার আশকলানী রহ •

চামড়া 4, পৃ 569-580

(হ্যরত আলীর ফযীলত ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত)

1. ইসলামের হ্যরত আলীরা কতজন খলিফা ছিলেন?
 2. হ্যরত আলীরা (রাঃ) কে কেন 'মুর্তজা' বলা হলো?
 3. জামালের যুদ্ধের কারণ কী ছিল?
 4. হ্যরত মুয়াবিয়ারার সেনাবাহিনী সিফফিনের যুদ্ধে কী করেছিল?
 5. হ্যরত আলীরা রাজধানী কোথায় স্থানান্তরিত করেন?
 6. হ্যরত আলীরাকে কে আহত করেন?
-

(38)

হ্যরত হাসান বিন আলীর খেলাফত ও পুনর্মিলন

হ্যরত আলীর শাহাদাতের পর হ্যরত হাসান বিন আলী কুফায় ইসলামের পঞ্চম খলিফা হন। তিনি ছিলেন নবী মুহাম্মদের নাতি। তিনি ছিলেন হ্যরত আলী ও হ্যরত ফাতেমার পুত্র। তাঁর খেলাফত ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তিনি শাস্তির জন্য বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। এই গল্প আমাদের শিক্ষা দেয় যে ঐক্যের জন্য মুসলমানদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

হ্যরত আলী (রাঃ) এর শাহাদাতের পর কুফাবাসী হ্যরত হাসানকে খলিফা করে। হজরত হাসান মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি মুসলমানদের কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী পথ দেখাব। তিনি অত্যন্ত নষ্ট, জানী এবং দয়ালু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এবং তাঁর ভাই হ্যরত হোসাইনকে ভালোবাসতেন এবং বলতেন, হাসান ও হোসাইন জানাতের যুবকদের নেতা।

কিন্তু হজরত হাসানের খেলাফতের শুরুতে সমস্যা দেখা দেয়। হজরত মুয়াবিয়া, যিনি সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন, তিনি হজরত হাসানের খেলাফত মেনে

নিতে চাননি। হ্যরত মুয়াবিয়া বললেন, আমি মুসলমানদের নেতা হব। তারা
সিরিয়ায় বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছে। হ্যরত হাসানও কুফায়
সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু
হ্যরত হাসান জানতেন যুদ্ধে বহু মুসলমান নিহত হবে, তাই তিনি শান্তির পথ
বেছে নেন।

হজরত হাসান হজরত মুয়াবিয়ার সঙ্গে সন্ধি করেন। হজরত হাসান বললেন,
কোরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করলে আমি খিলাফত ত্যাগ করব। চুক্তির শর্ত ছিল
হজরত মুয়াবিয়া খলিফা হবেন, তবে তিনি কাউকে তাঁর পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত
করবেন না এবং তাঁর পরে খিলাফত হজরত হাসানের কাছে ফিরে আসবে নাকি
মুসলমানদের পরামর্শে তা নির্ধারণ করা হবে। হ্যরত হাসান ও তার পরিবার
নিরাপদ থাকবে। হ্যরত মুয়াবিয়া এ শর্ত মেনে নেন। হ্যরত হাসান খিলাফত
ত্যাগ করে মদিনায় চলে যান।

কিছু লোক হজরত হাসানের সিদ্ধান্তে ব্যথিত হয়ে বললো: আপনি খিলাফত
ত্যাগ করলেন কেন? হ্যরত হাসান বলেন, আশ্লাহ চান আমরা ঐক্যবন্ধ হই।
তার আত্মত্যাগ মুসলমানদের মধ্যে একটি বড় যুদ্ধ প্রতিরোধ করে। হ্যরত
হাসান মদিনায় শান্তিতে বসবাস করতেন। তিনি কুরআন পাঠ করতেন, নামাজ
পড়তেন এবং মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন।

কিন্তু হযরত হাসানের জীবনের শেষ ছিল করুণ। রেওয়ায়েত অনুসারে, তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল, যার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মদীনায় মারা যান। তাকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়। হজরত হাসানের খেলাফত ও তার চুক্তি ছিল ইসলামের জন্য বিরাট ত্যাগ। তিনি ছিলেন নশ, দয়ালু এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় নাতি। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে শান্তি এবং ঐক্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

 ইঙ্গিত (রেফারেন্স)

আহাদিসঃ

সহীহ বুখারী: হাদীস নং 2704 •

বললেন: "ইনি আমার ছেলে সরদার, এবং তার ^{যাত্রা} (আল্লাহর রসূল মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের দুটি প্রধান দলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবেন")।

সহীহ মুসলিম: হাদীস নং 1821 •

(হযরত হাসান ও হযরত হোসাইনের ফযীলতের বর্ণনা এবং
জান্নাতের যুবকদের নেতা হওয়া)

বইয়ের ইতিহাস:

তাবারীর ইতিহাস - উস্মাহ ও রাজাদের ইতিহাস •

চামড়া 6, পৃ 150-165

(হ্যরত হাসানের খেলাফতের বিশদ বিবরণ, হজরত মুয়াবিয়ার সাথে
মতবিরোধ এবং পুনর্মিলন)

শুরু এবং শেষ - ইবনে কাসির রহ •

চামড়া 8, পৃ 40-55

(হ্যরত হাসানের খেলাফতের ঘোষণা, শান্তি চুক্তি এবং মৃত্যু)

খলিফাদের ইতিহাস - জালালউদ্দিন সিয়ুতি •

পাতা 191-194

(হ্যরত হাসানের বংশ, খেলাফত, শান্তি ও শাহাদাতের উল্লেখ)

হাসান ও মুয়াবিয়ার শান্তি - উইকিপিডিয়া নিবন্ধ •

(পটভূমি, বন্দোবস্তের শর্তাবলী এবং এর প্রভাবের বিশদ বিবরণ)

1. হ্যরত হাসানরা ইসলামের কতজন খলিফা ছিলেন?

2. হ্যরত হাসানরার পিতা ও মাতার নাম কি?

3. হ্যরত হাসানরা খিলাফতের সাথে কার সাথে শান্তি স্থাপন
করেছিলেন?

4. হ্যরত হাসানরা খিলাফত ত্যাগ করলেন কেন?

5. হ্যরত হাসানরা মদিনায় কী করেছিলেন?

6. হ্যরত হাসানরাকে কোথায় দাফন করা হয়?

(39)

❖ কারবালার ঘটনা: সত্যের মহান বলিদান

21 হিজরিতে ইরাকের কারবালায় একটি হৃদয়বিদারক ও শিক্ষণীয় ঘটনা ঘটে। হ্যরত হোসাইন বিন আলী (রা.) যিনি হ্যরত আলী (রা.) ও ফাতেমা (রা.)-এর পুত্র এবং মহানবী (সা.)-এর নাতি ছিলেন, এই স্থানেই শহীদ হন। এ ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সত্য ও ন্যায়ের জন্য জীবন দেওয়াও মহত্বের লক্ষণ।

হ্যরত হোসাইন ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, সাহসী ও ধার্মিক। তিনি এবং তার ভাই হ্যরত হাসান ছিলেন আল্লাহর রাসূলের প্রিয় নাতি। হজরত মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তার ছেলে ইয়াজিদ খিলাফত গ্রহণ করলেও অনেক মুসলিম তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে কারণ তিনি ইসলামী নীতি অনুসরণ করেননি।

কুফাবাসীরা হজরত হোসাইনকে চিঠি লিখে আমাদের নেতা হওয়ার আমন্ত্রণ জানায়, আমরা তার সঙ্গে আছি। হজরত হোসাইন মদিনা থেকে কুফায় যাত্রা করেন এবং তার পরিবার ও কয়েকজন অনুগত সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে যান।

পথিমধ্যে তাকে জানানো হয় যে, ইয়াজিদের চাপে কুফাবাসী পিছু হটেছে। তা

সত্ত্বেও হজরত হোসাইন (রা.) সত্যের পথে অটল থেকে যাত্রা চালিয়ে যান।

ইয়াজিদের গভর্নর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ সামরিক নেতৃত্ব উমর বিন সাদের

হাতে অর্পণ করেন, যিনি কারবালার ময়দানে হ্যরত হোসাইনকে অবরোধ

করেছিলেন। তাদের থেকে পানি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, এমনকি শিশুদের

তৃষ্ণার্ত রাখা হয়েছিল।

কারবালার ময়দানে হ্যরত হোসাইনের সাথে আহলে বাইত, সাহাবী ও

শিশুসহ প্রায় ৭২ জন লোক ছিল। হজরত হোসাইন তাঁর সঙ্গীদের অনুমতি

দিলেন যে, যে যেতে চায়, যেতে পারে, কিন্তু কেউই তার পাশ ছাড়েনি।

মহররমের ১০ তারিখে যুদ্ধ শুরু হয়। হ্যরত হোসাইনের সঙ্গীরা অতুলনীয়

বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর ভাই হজরত আববাস রাঃ, ভাতিজা হজরত কাসিম

রাঃ এবং পুত্র হজরত আলী আকবর (রা.) প্রাণ নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ

হন। এমনকি হ্যরত হোসেনের শিশুপুত্র হ্যরত আলী আসগরকেও

নির্মতাবে শহীদ করা হয়।

শেষে হ্যরত হোসাইন একাকী মাঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেনঃ

"আমি সত্যের জন্য যুদ্ধ করছি, আপনি কি ইসলাম ভুলে গেছেন?"

কিন্তু শক্ররা তাদের কথা শোনেনি। তারা হ্যরত হোসাইনকে ঘেরাও করে

শহীদ করে। তার শরীরে অসংখ্য ক্ষত ছিল এবং কারবালার মাঠ রঞ্জে ভরে
গিয়েছিল।

হযরত হোসেনের পরিবারকে প্রথমে কুফা এবং তারপর দামেক্ষে নিয়ে যাওয়া
হয়, যেখানে তাদের ইয়াজিদের দরবারে পেশ করা হয়। কারবালার ঘটনা
মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে গভীর শোক ও বেদনার জন্ম দেয়। হজরত হোসেনের
আত্মত্যাগ ইসলামের জন্য এক মহান দৃষ্টান্ত। সত্য, ন্যায় ও ধর্মের উচ্চারণের
জন্য তিনি জীবন দিয়েছেন।

আজও মুসলমানরা তাকে স্মরণ করে এবং বলে:
"হ্সাইন ছিলেন আল্লাহর রাসূলের প্রিয় নাতি, যিনি সত্ত্বের জন্য নিজের জীবন
উৎসর্গ করেছিলেন।"

 প্রামাণিক তথ্যসূত্র:

১৩০-১৫০ মু, ৬৫, তাবারীর ইতিহাস উম্মাহ ও রাজাদের ইতিহাস •

১৮৫-২০০ মু, ৮৫, ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ •

তিরমিয়ী, হাদীস নং: 3775 •

২২০-২৩০ মু, ২৫, জ্যাকোবি, জ্যাকোবিয়ান ইতিহাস •

1. হযরত হসাইনারা কার পুত্র ও নাতি ছিলেন?
 2. কুফার লোকেরা হযরত হসাইন (রা.) কে কোন আমন্ত্রণ জানিয়েছিল?
 3. হযরত হসাইনের সাথে কারবালায় কতজন লোক ছিল?
 4. হযরত হসাইন রাহের শিশু পুত্রের নাম কি?
 5. কোন তারিখে হযরত হসাইন রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হন?
 6. হযরত হসাইন (রাঃ) কিসের জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন?
-

(80)

মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান এবং উমাইয়া খিলাফতের সূচনা

হযরত হাসান ইবনে আলীর খিলাফত ত্যাগ করার পর হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহ ইসলামী খেলাফতের খলিফা হন। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবী এবং উমাইয়া রাজবংশের প্রথম খলিফা। তার শাসনামলে ইসলাম আরও ছড়িয়ে পড়ে। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে নেতৃত্বের জন্য জ্ঞান, ধৈর্য এবং দূরদর্শিতা প্রয়োজন।

মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন একজন অত্যন্ত জ্ঞানী, সহনশীল ও মেধাবী শাসক। তিনি উসমানের সময় থেকে সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। তিনি মুসলমানদের জন্য একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত আলীর শাসনামলে তারা খিলাফতকে স্বীকৃতি না দিয়ে সাফিনের যুদ্ধে তার সাথে যুক্ত করে। পরে হযরত হাসানের সাথে সম্মত করে তিনি খেলাফত গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রথম বংশগত খিলাফত, উমাইয়া খিলাফতের সূচনা করে তারা দামেঙ্ককে তাদের রাজধানী করে তোলে।

মুঘাবিয়ার সময়ে মুসলিমরা উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনর সহ অনেক এলাকা জয় করে। তারা সমুদ্রপথে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কনস্ট্যান্টিনোপলের কাছে পৌঁছেছিল। তার শাসনামলে মুসলিম শহরগুলোতে মসজিদ, রাস্তাধাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়। তিনি প্রশাসনিক সংস্কার করেন, যেমন ডাক ব্যবস্থা, সামরিক ক্যাম্প এবং সরকারি অফিসের সংগঠন।

হজরত মুঘাবিয়া ধৈর্যের সঙ্গে শাসন করেন। তিনি বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন। তিনি মুসলিমানদের মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। যাইহোক, তার একটি সিদ্ধান্ত উচ্চাহকে বিভক্ত করেছিল - যখন তিনি তার পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতের জন্য মনোনীত করেছিলেন। অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে খিলাফত নির্বাচিত হওয়া উচিত, বংশগত নয়। এই সিদ্ধান্তই পরবর্তীতে কারবালার ঘটনার ভিত্তি তৈরি করে।

হযরত মুঘাবিয়া দামেক্ষে ইস্তেকাল করেন। তিনি প্রায় ২০ বছর খিলাফত শাসন করেন। তার শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিশালী ও সংগঠিত হয়। তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী, একজন জ্ঞানী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং রাজনৈতিকভাবে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শাসক। তার খেলাফত ছিল উমাইয়া

রাজবংশের সূচনা। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে নেতৃত্ব মানে সম্প্রদায়ের
সেবা করা, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নেওয়া।

তথ্যসূত্র:

-১৮০^ম, চেতাবারীর ইতিহাস উন্মাদ ও রাজাদের ইতিহাস, জ ।

২০০

১২০-১৪০^ম, ৮৫, ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ ।

সহীহ বুখারী, হাদিস নং: 2705 (সাধারণ ধৈর্য ও নেতৃত্বের অধ্যায়ে) ।

২০০-২১৫^ম, ২৫, জ্যাকোবি, জ্যাকোবিয়ান ইতিহাস ।

1. হ্যরত মুয়াবিরা কোন পরিবারের সদস্য ছিলেন?
2. হ্যরত মুয়াবইয়ারা কাকে নিয়ে খিলাফত দখল করেছিলেন?
3. হ্যরত মুয়াবিয়ারা কোন শহরকে রাজধানী বানিয়েছিলেন?
4. হ্যরত মুয়াবইয়ারা মুসলমানদের জন্য কোন সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠা
করেছিলেন?

5. হ্যরত মুয়াবীরা তাঁর পুত্রকে খিলাফতের জন্য কী মনোনীত
করেছিলেন?

6. হ্যরত মুয়াবইয়ারা কোথায় ইস্তেকাল করেন?

(41)



ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার ঘটনা এবং তারসময়

হ্যরত মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া উমাইয়া
রাজবংশের খলিফা হন। তার শাসনামলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল,
যেমন কারবালার ঘটনা, হাররাহ ঘটনা এবং মক্কার বিদ্রোহ। তার খিলাফত
নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ ছিল। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে
নেতৃত্বের জন্য ন্যায়বিচার এবং ইসলামের নীতির আনুগত্য প্রয়োজন।

ইয়াজিদ দামেক্ষে খলিফা হন। তাঁর পিতা হজরত মুয়াবিয়া তাঁর জীবদ্ধশায় তাঁর
জন্য আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, যা নিয়ে অনেক সাহারী ও অনুসারীরা
আপত্তি করেছিলেন। হজরত হ্সাইন বিন আলী, হজরত আবদুল্লাহ বিন
জুবায়ের ও অন্যান্য বুজুর্গরা ইয়াজিদের খিলাফত মানতে অঙ্গীকার করেন।
তাদের ধারণা ছিল যে ইয়াজিদ ইসলামের নীতি লঙ্ঘন করেছে, তাই তাকে
খলিফা হতে দেওয়া যাবেনা। এই মতপার্থক্যের কারণেই কারবালার ঘটনা
ঘটে, যেখানে হজরত হোসাইন ও তাঁর পরিবার শহীদ হন।

কারবালার পর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ‘হারা ঘটনা’। মদীনার লোকেরা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বলেছিল যে আমরা ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দেব না। ইয়াজিদ মুসলিম বিন উকবার নেতৃত্বে মদীনায় বিশাল বাহিনী পাঠায়। এই বাহিনী মদীনা আক্রমণ করে, যাতে বহু সাহাবী, অনুসারী ও সাধারণ মুসলমান শহীদ হন। মদীনাবাসী পরাজিত হয়। এ ঘটনা মুসলমানদের জন্য খুবই দুঃখজনক।

ইয়াজিদের আমলেও মঙ্গায় বিদ্রোহ হয়েছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের ইয়াজিদের মৃত্যুর আগে খিলাফত দাবি করেন এবং হিজাজের লোকেরা তাঁর কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। ইয়াজিদ মঙ্গার দিকে অগ্রসর হয়। সেনাবাহিনী কাবার কাছে যুদ্ধ করেছিল, এবং মিনাজনিকের আক্রমণের ফলে কাবা আগুন ধরেছিল, এর ফ্যাব্রিক এবং দেয়ালকে প্রভাবিত করেছিল। এ ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে আরও উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

ইয়াজিদের খিলাফত মাত্র তিন বছর স্থায়ী হয়। তিনি দামেকে মারা যান। তার পর উমাইয়া খিলাফতে আরও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে বলেন, ইয়াজিদের সময়ে মুসলিম উন্মাহর মধ্যে বিভেদ বেড়ে যায়। তার শাসন সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে - কেউ বলেছেন তিনি ভুল করেছেন, কেউ বলেছেন তিনি পরিস্থিতির শিকার।

ইয়াজিদের আমলের ঘটনা মুসলমানদের জন্য এক বিরাট শিক্ষা। এই গল্পটি
আমাদের শিক্ষা দেয় যে, খলিফার দায়িত্ব শুধু শাসন করা নয়, ইসলামের নীতি
অনুযায়ী উন্মাহকে এক ক্যবিদ্ধ রাখা। কারবালা ও হররের মতো ঘটনা
মুসলমানদের মনে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

তাবারীর ইতিহাস উন্মাহ ও রাজাদের ইতিহাস, ভলিউম 7, পৃ. 10- •

30

ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ, ভলিউম 8, পৃষ্ঠা 230-250 •

জ্যাকোবি, জ্যাকোবিয়ান ইতিহাস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 250-265 •

(যদি হাদিস তিরমিয়ী #3780 ইয়াজিদ বা এই ঘটনার সাথে •

সম্পর্কিত হয় তবে এর পাঠ্য এবং প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে

পারে।)

1. ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া কোন পরিবারের খলিফা ছিলেন?

2. হ্যরত হ্সাইন (রাঃ) কেন ইয়াজিদের খিলাফত গ্রহণ করেননি?

3. হররার ঘটনা কোন শহরে ঘটেছিল?
4. ইয়াজিদের আমলে কোন ঘটনায় কাবা ধ্বংস হয়েছিল?
5. হ্যরত আবদুল্লাহরা ইবনে জুবায়ের খিলাফতের দাবি কোথায় দাবি করেছিলেন?
6. ইয়াজিদের খিলাফত কত বছর স্থায়ী হয়েছিল?

(42)



মক্কায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের

(রা.)-এর খিলাফত ও শাহাদাত

ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর মক্কায় এক বিরাট আন্দোলনের উৎসব হয়।

তাঁর সাহাবীগণ, ~~হজরত~~ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) যিনি মহানবী সা
হজরত জুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) এবং হযরত আসমা বিনতে আবি বকর
(রা.) এর পুত্ররা খিলাফত দাবি করেছিলেন। তার নেতৃত্বে হিজাজের জনগণ
ইয়াজিদের বংশগত খিলাফতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ইসলামের নীতির
ভিত্তিতে নেতৃত্বকে সমর্থন করে। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে ইসলামের
পক্ষে সত্যের পথে দাঁড়ানো গুরুত্বপূর্ণ, তা যতই শক্ত হোক না কেন।

ইয়াজিদের শাসনামলে কারবালার ঘটনা ও হারার ঘটনার পর মুসলমানদের
মধ্যে উদ্বেগ বেড়ে যায়। মদিনা ও মক্কার লোকেরা ইয়াজিদের খিলাফত মেনে
নিতে রাজি ছিল না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মক্কায় লোকদের
একত্র করে ঘোষণা করেন যে খিলাফত হবে ইসলামের নীতি অনুসারে,

বংশগত পদ্ধতিতে নয়। লোকেরা তাঁর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল

এবং তিনি মঞ্চাকে তাঁর রাজধানী করেছিলেন।

ইয়াজিদের জীবনের শেষ দিনে হসাইন বিন নামিরের নেতৃত্বে একটি বাহিনী

মঞ্চা আক্রমণ করে, কিন্তু ইয়াজিদের মৃত্যুর সংবাদ শুনে সেনাবাহিনী পিছু

হটে। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর উমাইয়া খিলাফতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যার উপকার হয় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের। তাঁর খিলাফত শক্তিশালী হয়

এবং তিনি হাজাজ, ইরাক ও মিশরের কিছু অংশের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। তার ভাই মুসাব বিন জুবায়ের ইরাকের গভর্নর হন।

যাইহোক, উমাইয়া রাজবংশ মারওয়ান বিন হুকাম এবং পরবর্তীতে তার পুত্র আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নেতৃত্বে ক্ষমতা ফিরে পায়। আব্দুল মালিক

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি তার

সেনাপতি হাজাজ বিন ইউসুফকে বিশাল বাহিনী নিয়ে মঞ্চায় পাঠান।

তীর্থ্যাত্রীরা মঞ্চা অবরোধ করে এবং কাবাকে পাথর নিক্ষেপ করে, কাবার ক্ষতি করে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তিনি তার

সঙ্গীদের বললেন:

"আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছি, ভয় পেয়ো না!"

তার মা হযরত আসমাৱ তাকে উৎসাহিত কৰে বললেন:

"আঁল্লাহৰ পথে শাহাদাত বড় সম্মান, সাহস হাৱাবেন না।"

অবশেষে তুমুল যুদ্ধেৰ পৰ হজৱত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েৱ (রা.) শহীদ হন।

উমাইয়া বাহিনী মক্কা দখল কৰে। তাঁৰ শাহাদাত মুসলমানদেৱ জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা এবং তাঁৰ আগ্রাহ্য ইসলামেৰ ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হজৱত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েৱ (রা.)-এৰ খিলাফত ছিল ইসলামেৰ জন্য এক বিৱাট প্ৰচেষ্টা। তিনি সত্য, ন্যায় ও নীতিৰ জন্য প্ৰাণ দিয়েছেন। তিনি সাহসী, তিনি একজন প্ৰশংসনিকত সঙ্গী ছিলেন। তাঁৰ ~~বৈ~~ ধৈর্যমীল এবং একজন নবী জীবন আমাদেৱ শিক্ষা দেয় যে সত্যেৰ পথে অবিচল থাকাই আসল সাফল্য।

তথ্যসূত্র:

তাৰামীৰ ইতিহাস উন্মাহ ও রাজাদেৱ ইতিহাস, ভলিউম 7, পৃ. 50- •

70

ইবনে কসিৱ রহ শুল্ক এবং শেষ, ভলিউম 8, পৃষ্ঠা 270-290 •

জ্যাকোবি, জ্যাকোবিয়ান ইতিহাস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 270-285 •

সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: 2470 (যদি এই হাদিসটি হজরত •

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর ফজিলত বা শাহাদাতের সাথে

সম্পর্কিত হয়, তাহলে এর পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে)

1. হযরত আবদুল্লাহরা ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এর পিতা ও মাতার নাম
কি?
2. হযরত আবদুল্লাহরা ইবনে জুবায়ের খিলাফতের দাবি কোথায় দাবি
করেছিলেন?
3. হযরত আবদুল্লাহরা ইবনে জুবায়ের (রহঃ) এর ভাইয়ের নাম কি এবং
তিনি কোথায় ছিলেন?
4. হযরত আবদুল্লাহরা ইবনে যুবাবাইরার বিরুদ্ধে উমাইয়া সেনাবাহিনীর
নেতৃত্ব কে দেন?
5. কোন ঘটনায় কাবা শাসাব শাস্ত্রের ক্ষতি হয়েছিল?
6. হযরত আসমা (রা.) শাহাদাতের পূর্বে তাঁর পুত্রকে কী উপদেশ
দিয়েছিলেন?

(43)



আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এবং উমাইয়া খিলাফত পুনরুদ্ধার

ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর উমাইয়া খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে। হজরত
আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) মক্কায় খিলাফত ঘোষণা করেন এবং হিজাজ,
ইরাক এবং মিশরের অনেক অঞ্চলের মানুষ তাঁর কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার
করেন। অন্যদিকে সিরিয়ায় উমাইয়া রাজবংশের অশাস্তি চলছিল। মারওয়ান
বিন লুকাম খিলাফত গ্রহণ করেন এবং বনু উমাইয়াদের একত্রিত করার চেষ্টা
করেন, কিন্তু এর পরেই তিনি মারা যান। তাঁর পরে তাঁর পুত্র আবদুল মালিক বিন
মারওয়ান খলিফা হন।

আবদুল মালিক ছিলেন একজন বিদ্঵ান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রতিভাবান শাসক।
তিনি বললেনঃ

"আমি উমাইয়া খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব।"

তার শাসনামলে বেশ কিছু বিদ্রোহ হয়েছিল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের

(রা.) মঙ্কাকে রাজধানী করেন এবং ইরাকসহ অনেক এলাকায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। খাওয়ারিজ ও অন্যান্য দলও বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহ করছিল।

এই বিদ্রোহ দমনের জন্য আবদ আল-মালিক তার সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে নিযুক্ত করেন। হজ মঙ্কা অবরোধ করে, কাবাকে পাথর নিক্ষেপ করে এবং প্রচণ্ড ঘুঁটের পর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের শহীদ হন। এই বিজয় উমাইয়া খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

আব্দুল মালিক খিলাফত সংগঠিত করার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন:

আরবিকে সরকারি ভাষা করা হয়, যাতে ইসলামী পরিচয় সুন্দর হয় •

নতুন ইসলামী মুদ্রা জারি করা হয়েছে যার উপর কুরআনের আয়াত
লেখা ছিল

দামেক্ষে বিশাল উমাইয়া মসজিদ নির্মিত হয়েছিল •

তিনি জেরজালেমে ডোম অফ দ্য রক (ডোম অফ দ্য রক) তৈরি •

করেছিলেন, যা এখনও ইসলামিক স্থাপত্যের একটি মাস্টারপিস।

তার শাসনামলে ইসলাম সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হয়। উত্তর আফ্রিকায় মুসা
ইবনে নাসির বিজয় অর্জন করেছিলেন, এবং স্পেনের বিজয় তারিক ইবনে

জিয়াদ দ্বারা শুরু হয়েছিল, যা আবদ আল-মালিকের পুত্র ওয়ালিদের
শাসনামলে সম্পন্ন হয়েছিল। মধ্য এশিয়াতেও ইসলামী বিজয় অব্যাহত ছিল।

আবদ আল-মুলক ইবনে মারওয়ান দামেক্ষে মারা যান এবং তার পুত্র ওয়ালিদ
ইবনে আবদ আল-মুলক খলিফা হন। আব্দুল মালিকের খেলাফত উমাইয়া
রাজবংশের জন্য একটি স্বর্ণযুগ হিসেবে প্রমাণিত হয়। তিনি একজন জ্ঞানী,
সাহসী এবং পরিকল্পনাকারী শাসক ছিলেন।

এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে নেতৃত্বের জন্য জ্ঞান, সাহস এবং কৌশল
প্রয়োজন। আবদ আল-মুলক অশাস্ত্রির সময় উম্মাহকে সংগঠিত করেছিলেন
এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তথ্যসূত্র:

তাবারীর ইতিহাস উম্মাহ ও রাজাদের ইতিহাস, ভলিউম 7, পৃ. •

100-120

ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ, ভলিউম 9, পৃ. 10-30 •

বেলাজারি, দেশগুলোর বিজয়, পৃষ্ঠা 250-265 •

জ্যাকোবি, জ্যাকোবিয়ান ইতিহাস, ভলিউম 2, প. 300-315 •

1. আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান কোন পরিবারের খলিফা ছিলেন?
2. হ্যরত আবদুল্লাহরা ইবনে জুবায়ের কোথায় খিলাফত ঘোষণা করেছিলেন?
3. বিদ্রোহ দমন করার জন্য আবদুল মালিক কোন সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন?
4. আবদুল মালিকের দাপ্তরিক ভাষা কী ছিল?
5. আবদুল মালিকের রাজত্বকালে জেরুজালেমে কোন বিখ্যাত ভবন নির্মিত হয়েছিল?
6. আবদুল মালিকের পর খিলাফত কার কাছে গেল?

(44)



হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রাহ.: ন্যায়ের আলো

আবদ আল-মালিক বিন মারওয়ানের পরে উমাইয়া রাজবংশের একজন খলিফা আসেন যাকে ইতিহাস "উমর দ্বিতীয়" হিসাবে স্মরণ করে। তিনি ছিলেন হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.)- ন্যায় ও ধর্মপ্রায়ণতার প্রতীক, যার খিলাফত ইসলামের জন্য স্বর্গযুগ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে সরকার কেবল ক্ষমতার জন্য নয়, ন্যায়বিচার, সততা এবং সেবার বিষয়ে।

হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) ছিলেন খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের ভাতিজা। খেলাফতের আগে, তিনি মদিনার গভর্নর ছিলেন, যেখানে তিনি জ্ঞান, সততা এবং সরলতার উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। খলিফা হওয়ার পর তিনি বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করেন। তিনি বললেনঃ আমি হজরত ওমর ফারুকের সরল জীবন অবলম্বন করব।

তারা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে, সাধারণ পোশাক

পরতে শুরু করে এবং বাইত আল-মালকে জনসেবায় উৎসর্গ করে।

হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রাহিমাহল্লাহ তাঁর ন্যায়বিচার ও
ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি যাকাত ব্যবস্থাকে এমনভাবে
সংগঠিত করেছিলেন যে কোনো কোনো এলাকায় কোনো যোগ্য ব্যক্তি
অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর সময়ে যাকাতের পরিমাণ এত বেশি সংগ্রহ করা হয়েছিল
যে তা বট্টনের জন্য সুবিধাভোগী খুঁজে পাওয়া কঢ়িন ছিল। তিনি অমুসলিম
প্রজাদের প্রতিও নমতা ও ন্যায়বিচার প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি নয়জন
মুসলমানের কাছ থেকে জিজিয়া নেওয়া বন্ধ করে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত
করেন।

তিনি কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে জনপ্রিয় করেন। তিনি আলেমদের কাছ
থেকে পরামর্শ নিতেন, তাদের সম্মান করতেন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা
করতেন। তিনি হাদীসের সম্পাদনা শুরু করেন এবং ইমাম ইবনে শিহাব আল-
জাহরীর মতো জায়েদ আলেমদেরকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি
গভর্নরদের কঠোরভাবে জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার করতে, তাদের উপর
অত্যাচার না করার এবং বায়তুল-মালকে একটি ট্রাস্ট হিসাবে গণ্য করার
নির্দেশ দেন। তাঁর শাসনামলে মসজিদ, মাদ্রাসা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়
এবং মুসলিম রাষ্ট্র শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়।

দুর্ভাগ্যবশত হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.)-এর খিলাফত মাত্র দুই
বছর স্থায়ী হয়। কিছু উমাইয়া প্রধান তার সংস্কারে অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিছু
রেওয়ায়েত অনুসারে, তাকে বিষ দেওয়া হয়েছিল, তবে ঐতিহাসিকরা এ
নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। অসুস্থতার সময় তিনি বলেছিলেন:
"আল্লাহ আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং এখন আমি তার দিকে ফিরে
যাচ্ছি।"
তিনি মারা যান এবং তাকে সিরিয়ায় দাফন করা হয়।

হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.)-এর খিলাফত মুসলমানদের জন্য
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক ও ইসলামের একজন খাঁটি
সেবক। তাঁর জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় যে নেতৃত্ব মানে আল্লাহর সন্তুষ্টির
জন্য জীবনযাপন করা এবং বান্দাদের প্রতি ন্যায়বিচার ও দয়া করা।

তথ্যসূত্র:

তাবারীর ইতিহাস উম্মাহ ও রাজাদের ইতিহাস, ভলিউম 7, পৃষ্ঠা •

250-270

ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ, ভলিউম 9, পৃ. 190-210 •

ইবনে আসাকার, মদিনা দামেক্সের ইতিহাস, ভলিউম। 45, পৃ. •

120-140

মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং: 23560 (যদি এই হাদিসটির
প্রেক্ষাপট হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর
সাথে সম্পর্কিত হয়) •

1. হযরত উমর ইবনে আবদুল আয়ীজকে ইতিহাসে কোন উপাধিতে
স্মারণ করা হয়?
2. হযরত উমর ইবনে আবদুল আয়ীজ (রহ.) খিলাফতের পূর্বে কোন
শহরের গভর্নর ছিলেন?
3. হযরত উমর ইবনে আবদুল আয়ীজ তাঁর জীবনে কি পরিবর্তন
এনেছিলেন?
4. হযরত উমর ইবনে আবদুল আয়ীয় (রাঃ) কিভাবে যাকাত প্রণয়ন
করেন?
5. হযরত উমর ইবনু আবদুল আয়ীজ (রাঃ) হাদিস রচনার জন্য কোন
আলেমকে নিয়োগ করেছিলেন?
6. হযরত উমর ইবনে আবদুল আয়ীজের খিলাফত কত বছর স্থায়ী
হয়েছিল?

(45)



উমাইয়াখিলাফতের পতন এবং আববাসীয় খিলাফতের সূচনা

132 হিজরিতে, ইসলামী ইতিহাসের একটি মোড় ঘটল। প্রায় এক শতাব্দী ধরে চলা উমাইয়া খিলাফতের অবসান ঘটে এবং আববাসীয় খিলাফত দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এ ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ন্যায়বিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও জনসমর্থন ছাড়া কোনো সরকারই টিকে থাকতে পারেনা।

প্রথম দিকে, উমাইয়া খিলাফত স্পেন থেকে মধ্য এশিয়ায় ইসলাম প্রচার করে। তার শাসনামলে বিজয়, বুদ্ধিগৃহিতেক উন্নতি এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ছিল। কিন্তু শেষ সময়ে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। কিছু খলিফা বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন, জনকল্যাণকে অবহেলা করতেন এবং আরব ও অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করতেন। খাওয়ারিজ, শিয়া ও অন্যান্য দল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে।

তার চাচা হযরত আববাস বিন সেই সাথে আববাসীয় পরিবারে যে রাসূল সা আব্দুল মুতালিবের বংশের ছিলেন, তিনি উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং

ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি খেলাফত পুনরুদ্ধার করবেন। তাদের আন্দোলনের নেতা ছিলেন আবু মুসলিম খোরাসানি, একজন দক্ষ ও সম্পদশালী জেনারেল। তিনি খোরাসানে (বর্তমান পূর্ব ইরান) জনগণকে জড়ে করেন, কালো পতাকা উত্তোলন করেন এবং ঘোষণা করেন যে আমরা উমাইয়াদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদ করব।

আববাসীয় আন্দোলন জনসমর্থন লাভ করে। তিনি কুফায় পৌঁছে আবু আল-আববাস আল-সাফাহকে খলিফা নিযুক্ত করেন। উমাইয়া খিলাফতের শেষ খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ আববাসীয়দের বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনী গড়ে তোলেন। জাবনদীর তীরে দুই বাহিনীর মধ্যে একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে আববাসীয়রা বিজয়ী হয়। মারওয়ান মিশরে পালিয়ে যান, যেখানে তাকে বন্দী করে হত্যা করা হয়। এর মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফতের অবসান ঘটে।

আববাসীয়রা দামেক্ষে প্রবেশ করে এবং উমাইয়া পরিবারের অনেক সদস্যকে হত্যা করে। যাইহোক, উমাইয়া যুবরাজ আবদ আল-রহমান আন্দালুসিয়ায় (স্পেন) পালিয়ে যান, যেখানে তিনি উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা কয়েক শতাব্দী ধরে চলে। আববাসীয়রা প্রথমে কুফাকে তাদের রাজধানী করেছিল এবং পরে বাগদাদকে ইসলামী বিশ্বের একাডেমিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।

আববাসীয়রা ঘোষণা করেছিল যে তাদের সরকার হবে কুরআন ও সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে। তাঁর সময়ে জ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা ও অন্যান্য বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। এই পরিবর্তন ইসলামিক স্টেটের জন্য একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে প্রমাণিত হয়।

উমাইয়া খিলাফতের পতন এবং আববাসীয় খিলাফতের সূচনা মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে শাসন শুধু বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, ন্যায়বিচার, সততা এবং জনসেবার মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র:

তাবারীর ইতিহাস উন্নাহ ও রাজাদের ইতিহাস, ভলিউম ৪, পৃ. •

100-120

ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ, ভলিউম 10, পৃ. 10-30 •

বেলাজারি, দেশগুলোর বিজয়, পৃষ্ঠা 300-315 •

জ্যাকোবি, জ্যাকোবিয়ান ইতিহাস, ভলিউম 3, পৃ. 100-115 •

1. উমাইয়া খিলাফতের অবসান ঘটে কোন বছর?

2. আবাসীয় আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?
 3. কোন শহরকে আবাসীয়রা তাদের প্রথম রাজধানী বানিয়েছিল?
 4. উমাইয়া খিলাফতের শেষ খলিফার নাম কি?
 5. উমাইয়া যুবরাজ আবদুর রহমান কোথায় পালিয়ে গেলেন?
 6. কিসের ভিত্তিতে আবাসীয় খিলাফত তার সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিল?
-

(46)



আবুআল-আববাসসাফাহ: আববাসীয় খিলাফতের প্রথম খলিফার গল্প

উমাইয়া খিলাফতের অবসানের পর আববাসীয় রাজবংশ খিলাফত দখল করে।

আববাসীয়দের প্রথম খলিফা ছিলেন আবু আল-আববাস সাফাহ, রাসূল সা-
তাঁর চাচা ছিলেন হযরত আববাস বিন আব্দুল মুতালিবের বংশধর। তার
সংক্ষিপ্ত কিন্তু কার্যকর শাসন ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি নতুন সূচনা করে।
এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে নেতৃত্বের জন্য সাহস, ন্যায়বিচার এবং ঐক্য
প্রয়োজন।

আবু আল-আববাস ছিলেন আববাসীয় বিদ্রোহের প্রধান নেতা। তার ভাই
ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিলেন,
কিন্তু তাকে বন্দী করে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর আবু আল আববাস
নেতৃত্বের দায়িত্ব নেন। তিনি আবু মুসলিম খোরাসানির মতো যোগ্য
সেনাপতিদের সাথে উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে ঘূর্ণ করেছিলেন।
আববাসীয়রা জাব নদীর তীরে একটি সিদ্ধান্তমূলক ঘূর্ণ বিজয়ী হয়েছিল, যার
পরে কুফার লোকেরা আবু আল-আববাসকে খলিফা নিযুক্ত করেছিল।

তিনি "সাফফাহ" উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, যার অর্থ "রক্তচূর্ণকারী" - একটি উপাধি যা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। আবু

আল-আবাস মসজিদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন:

পরিবারের বৎসর এবং আমরা ইসলামে^১ "আমরা আল্লাহর রাসূল সা
ন্যায়বিচার ও ন্যায়তা ফিরিয়ে আনব।"

তিনি কুফাকে আববাসীয় খিলাফতের প্রাথমিক রাজধানী করেন।

তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল উমাইয়া প্রভাবের অবসান ঘটানো। তিনি বনু
উমাইয়ার বহু লোককে হত্যা করেছিলেন যাতে আবার বিদ্রোহ না হয়।
যাইহোক, উমাইয়া যুবরাজ আবদ আল-রহমান আন্দালুসিয়ায় (স্পেন)
পালিয়ে যান, যেখানে তিনি উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

আবু আল-আবাসের শাসনামলে খারিজি এবং কিছু শিয়া দল জড়িত ছিল বেশ
কিছু বিদ্রোহ। এসব বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি আবু মুসলিম খোরাসানিকে
পাঠান। আবু মুসলিম নতুন গভর্নর নিয়োগ করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে
এক্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। আবু আল-আবাস পঞ্চতদের সম্মান
করতেন, কোরআন ও হাদিসের শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং ধর্মীয়
ভিত্তিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

আবু আল-আবাসের খেলাফত মাত্র চার বছর স্থায়ী হয়েছিল। তিনি আনবার
শহরে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি
তার ভাই আবু জাফর আল-মনসুরকে তার উত্তরসূরি নিযুক্ত করেন। যদিও
তার শাসনকাল সংক্ষিপ্ত ছিল, তবুও তিনি দৃঢ়ভাবে আবাসীয় খিলাফতের
ভূমিকা স্থাপন করেছিলেন। তিনি সাহসী, সম্পদশালী এবং আল্লাহর রাসূল সা-
বংশের গৌরব ছিল তার।

এই গল্প আমাদের শেখায় যে নেতৃত্ব মানে শুধু ক্ষমতা নয়, সত্য, ন্যায় ও
উম্মাহর ঐক্যের সংগ্রাম।

তথ্যসূত্র:

তাবারীর ইতিহাস উম্মাহ ও রাজাদের ইতিহাস, ভলিউম 8, পৃ. •

150-170

ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ, ভলিউম 10, পৃষ্ঠা 50-70 •

জ্যাকোবি, জ্যাকোবিয়ান ইতিহাস, ভলিউম 3, পৃ. 120-135 •

মাসুদি, জনপ্রিয় সোনা, ভলিউম 3, পৃ. 200-215 •

1. আবুল আববাস সাফাহ কোন পরিবারের প্রথম খলিফা ছিলেন?
 2. আবু আল-আববাস আল-সাফাহ কোন শহরকে খিলাফতের রাজধানী বানিয়েছিলেন?
 3. আবু আল-আববাস সাফাহ কোন সেনাপতির সাথে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন?
 4. উমাইয়া যুবরাজ আবদুর রহমান কোথায় পালিয়ে গেলেন?
 5. আবুল আববাস সাফাহ খিলাফত কর বছর স্থায়ী হয়েছিল?
 6. আবু আল-আববাস আল-সাফার পরে খিলাফত কে পেয়েছিল?
-

(47)



আবুজাফরআল-মনসুর:আববাসীয় খিলাফতেরপ্রতিষ্ঠারগল্প

আবু আল-আববাস সাফাহ-এর মৃত্যুর পর, তার ভাই আবু জাফর আল-মনসুর
আববাসীয় খিলাফতের দ্বিতীয় খলিফা হন। তিনি ছিলেন একজন সচেতন,
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রতিভাবান শাসক। তার নেতৃত্বে আববাসীয় খিলাফত
স্থিতিশীলতা লাভ করে এবং মহান বাগদাদ শহর প্রতিষ্ঠা করে। এই গল্পটি
আমাদের শেখায় যে নেতৃত্বের জন্য জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং পরিকল্পনা প্রয়োজন।
আবু জাফর খিলাফত গ্রহণ করার সাথে সাথে তিনি অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন
হন। তার চাচা আবদুল্লাহ বিন আলী খিলাফত দাবি করেন এবং বিদ্রোহ করেন,
যা আবু জাফর তার জেনারেল আবু মুসলিম খোরাসানির মাধ্যমে দমন করেন।
তবে আবু মুসলিমের ক্রমবর্ধমান প্রভাব আবু জাফরের জন্য হমকি হয়ে
দাঁড়ায়। তিনি আবু মুসলিমকে দরবারে ডেকে হত্যা করেন। এই সিদ্ধান্ত
রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত ছিল, কিন্তু খেলাফতের স্থিতিশীলতার জন্য
প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল।

আবু জাফর আল-মনসুরের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল বাগদাদ শহর নির্মাণ।

তারা টাইগ্রিস নদীর তীরে একটি নতুন রাজধানী নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল,
যার নাম "মদিনা আল-সালাম" যার অর্থ "শাস্তির শহর"। শহরটি একটি
বৃত্তাকার আকৃতিতে নির্মিত হয়েছিল, যার কেন্দ্রে ছিল খলিফার প্রাসাদ এবং
জামে মসজিদ। বাগদাদ শীঘ্ৰই ইসলামী বিশ্বের জ্ঞান, বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও
রাজনীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়।

আবু জাফর ন্যায়বিচারের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করেন। তিনি আলেমদের
সম্মান করতেন এবং হাদিস ও আইনশাস্ত্রের শিক্ষাকে প্রচার করতেন। তিনি
গভর্নরদের উপর কড়া নজর রাখতেন এবং জনকল্যাণকে আগাধিকার দিতেন।
শিয়া ও খারজি দলগুলো তার বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকলেও তিনি খিলাফতকে
ঐক্যবদ্ধ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তারা সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করেছিল
এবং রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সীমান্ত যুদ্ধও চালিয়েছিল।

আবু জাফর আল-মনসুরের শাসনকাল প্রায় 21 বছর (754 থেকে 775
খ্রিস্টাব্দ) স্থায়ী ছিল। আনবার শহরের কাছে যথন তিনি মারা যান তখন তিনি
তীর্থযাত্রায় ছিলেন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র মাহদী আববাসীয় খিলাফতের খলিফা
হন। আবু জাফরকে "আল-মানসুর" বলা হয় যার অর্থ "বিজেতা", কারণ তিনি
একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর আববাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও ইসলামী শাসক। তাঁর জীবন আমাদের শেখায় যে নেতৃত্ব কেবল শক্তি নয়, জ্ঞান, ন্যায়বিচার এবং জাতির সেবা।



তথ্যসূত্র:

তাবারীর ইতিহাস উম্মাহ ও রাজাদের ইতিহাস, ভলিউম 8, পৃষ্ঠা ।

200-230

ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ, ভলিউম 10, পৃ. 100-120 ।

মাসুদি, জনপ্রিয় সোনা, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 250-270 ।

জ্যাকোবি, জ্যাকোবিয়ান ইতিহাস, ভলিউম 3, পৃ. 150-170 ।

1. আববাসীয় খিলাফতের আবু জাফর আল-মনসুর কতজন খিলাফা

ছিলেন?

2. আবু জাফর আল-মনসুর কোন শহর আবিষ্কার করেন?

3. আবু জাফর আল-মনসুর তার সেনাপতি আবু মুসলিমের সাথে কী
করেছিলেন?

4. বাগদাদ শহরের নাম কি?
 5. আবু জাফর আল-মনসুরের শাসন কর্তৃ বছর স্থায়ী হয়েছিল?
 6. আবু জাফর আল মনসুরের পর খিলাফত কে পেল?
-

(48)

হারুন আল-রশিদের গন্ধ এবং আববাসীয় খিলাফতের উত্থান

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে আববাসীয় খিলাফত তার গৌরবময় সময় অতিক্রম

করছিল। আববাসীয় রাজবংশের পঞ্চম খলিফা হারুন আল-রশিদের শাসনামলে বাগদাদ জ্ঞান, বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই গন্ধ আমাদের শিক্ষা দেয় যে নেতৃত্ব, জ্ঞান এবং ন্যায়বিচারের সমন্বয় ইসলামী রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে।

হারুন আল-রশিদ ছিলেন খলিফা মাহদীর পুত্র। খলিফা হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় 22 বছর। তিনি মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক শাসন করব। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি প্রায়ই হজ করতেন এবং রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। লোকেরা তাকে "আল-রশিদ" বলে ডাকত, যার অর্থ "একজন"।

হারুনের সময় বাগদাদ ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহর। তিনি "বায়ত আল-হিকামত" প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে তার পুত্র মামুন দ্বারা সম্প্রসারিত হয়।

এখানে গ্রীক, ফার্সি ও ভারতীয় বই অনুবাদ করা হয়। পশ্চিতরা জ্ঞান অধ্যয়নের জন্য বাগদাদে আসেন। হারুনের দরবারে কবি, বিজ্ঞানী ও আইনবিদদের সম্মান করা হতো। ইসলামি বিজ্ঞান, গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্র তার সময়ে অনেক উন্নত হয়েছিল।

হারুনের শাসনামলে মুসলিম রাষ্ট্র অনেক বড় ছিল। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেছেন। তিনি সাইপ্রাস আক্রমণ করেছিলেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করতে পারেননি। তার সেনাপতিরা উত্তর আক্রিকা ও মধ্য এশিয়ায় ইসলাম প্রচার করেন। ব্যবসার জন্য তিনি নতুন রাস্তা ও বাজার নির্মাণ করেন। বাগদাদ থেকে ব্যবসায়ীরা চীনে যেতেন।

কিন্তু হারুন তার শেষ দিনগুলোতে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। তার দুই ছেলে আমিন ও মামুন খিলাফতের উত্তরাধিকারের জন্য লড়াই শুরু করেন। হারুন উত্তরাধিকারের জন্য রাজ্যটিকে দুই ভাগে ভাগ করেন, যা পরবর্তীতে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। খোরাসানে বিদ্রোহ দমন করতে যাওয়ার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান। তার মৃত্যুর পর আমিন খিলিফা হন কিন্তু মামুনের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন।

হারুন আল-রশিদের শাসনামল ছিল ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী ও ইসলামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। এই গল্পটি আমাদের

শেখায় যে নেতৃত্বের জ্ঞান, ন্যায়বিচার এবং ধর্মের প্রতি ভালবাসা থাকলে
রাষ্ট্রের উন্নতি হয়।

রেফারেন্সের জন্য ইঙ্গিত:

৩৩০-৩০০ ম, ৮৫, তাবারীর ইতিহাস উপ্পাহ ও রাজাদের ইতিহাস •

২০০-২৩০ ম, ১০৫, ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ •

১০০-১২০ ম, ৫৫, মাসুদি, জনপ্রিয় সোনা •

২৫০-২৭০ ম, ৩৫, জ্যাকোবি, জ্যাকোবিয়ান ইতিহাস •

1. হারুন আল-রশীদ কোন খলিফার পুত্র ছিলেন?
2. হারুন আল-রশীদকে কোন উপাধিতে সন্মান করা হয়েছিল?
3. হারুন আল-রশীদ জ্ঞানের প্রচারের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা
করেছিলেন?
4. হারুন আল-রশীদের রাজত্বকালে বাগদাদ কী ধরনের শহরে পরিণত
হয়েছিল?

5. হারুন আল-রশিদের পর কোন দুই ছেলের খিলাফত নিয়ে বিরোধ

চির?

6. হারুন আল-রশিদের রাজত্বকালকে ইসলামের ইতিহাসে স্মরণ করা

হয়?

(49)

ইমামআবুহানিফা, মুহাম্মদ(সাঃ) এরজীবন কাহিনী এবং হানাফী আইনশাস্ত্র

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে কুফায় একজন মহান আলেম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল নুমান বিন সাবিত, যিনি ইমাম আবু হানিফা নামে পরিচিত হন। তিনি ইসলামী আইনশাস্ত্রের পথপ্রদর্শক এবং হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই গল্প আমাদের শিক্ষা দেয় যে আমাদের জ্ঞান ও ধৈর্যের সাথে ইসলামের সেবা করতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা 81 হিজরিতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। শৈশবে তিনি কুরআন মুখ্যভাবে করেন এবং হাদীস শেখা শুরু করেন। তিনি কুফার বিখ্যাত পণ্ডিত হামাদ বিন আবি সুলাইমানের কাছ থেকে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি এত জ্ঞানী হয়েছিলেন যে লোকেরা তাকে "ইমাম-ই-আজম" (মহান ইমাম) বলে ডাকত।

ইমাম আবু হানিফা ফিকাহশাস্ত্রের একটি নতুন ব্যবস্থা তৈরি করেন। ইসলামী আইনের সমাধান পেশ করতে তিনি কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের মতামত ও

যুক্তি ব্যবহার করেছেন। তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে ফতোয়া দিতেন। তাঁর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ তাঁর শিক্ষা ছড়িয়ে দেন। তার এই পদ্ধতি "হানাফী ধর্ম" নামে পরিচিতি লাভ করে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. তারা ব্যবসা করেছে, কিন্তু কখনোই অন্যায্য লাভ করেছে। তিনি গরীবদের সাহায্য করতেন এবং তার সম্পত্তি দান করতেন।

তিনি উমাইয়া ও আববাসীয় খলিফার অধীনে বসবাস করতেন, কিন্তু তিনি কখনোই খলিফার অত্যাচারে রাজি হননি। তিনি কাজীর পদ গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করেন কারণ তিনি সত্যের পথে অটল থাকতে চেয়েছিলেন।

আববাসীয় খলিফা মনসুর তাকে কাজীর পদের প্রস্তাব দেন, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রাজি হননি। এ কারণে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তিনি কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং 150 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। হাজার হাজার মানুষ তার জানাজায় অংশ নেন। তাকে বাগদাদে সমাহিত করা হয়।

ইমাম আবু হানিফার হানাফী মাযহাব এখনও বিশ্বের অনেক মুসলমান অনুসরণ করে। তিনি ছিলেন জ্ঞানী, ধৈর্যশীল এবং ইসলামের একজন খাঁটি সেবক। এই গল্প আমাদের শিক্ষা দেয় যে জ্ঞান ও সত্যের পথে চললে ইসলামের সেবা করা

যায়।

 রেফারেন্সের জন্য ইঙ্গিত:

১৩০—॥১০, মসজিদ, ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ •

১৫০—৮৬৫, মসজিদ, ইবনে হাজার, সভ্যতা •

২৫—১০, মসজিদ, ইমাম আবু ইউসুফ রহ যুগের বই •

খতিব বাগদাদী, বাগদাদের ইতিহাস, ভলিউম। 13, পৃ. 320-340 •

1. ইমাম আবু হানিফার আসল নাম কি?
2. ইমাম আবু হানিফা কোন শিক্ষকের কাছ থেকে ফিকহ শিখেছিলেন?
3. ইমাম আবু হানিফার দুই বিখ্যাত শিষ্যের নাম কী ছিল?
4. ইমাম আবু হানিফা কেন কাজী পদ গ্রহণ করলেন না?
5. ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) কোন সালে ইন্দৱিত হন?
6. ইমাম আবু হানিফাকে কোথায় দাফন করা হয়?

(50)

ইমাম মালিক ও মালেকী আইনশাস্ত্রের কাহিনী

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে মদিনায় একজন মহান আলেম জন্মগ্রহণ করেন।

তার নাম ছিল মালিক বিন আনাস, যিনি ইমাম মালিক নামে পরিচিত। তিনি ইসলামী আইনশাস্ত্রের একজন মহান ইমাম এবং মালিকি মাঝতাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই গল্প আমাদের শিক্ষা দেয় যে হাদিস ও সত্ত্বের প্রতি ভালোবাসা

ইসলামের দিকে নিয়ে যায়।

ইমাম মালিক ৯৩ হিজরীতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার ছিল জ্ঞানী ও ধার্মিক। শৈশবে তিনি কুরআন মুখ্যস্ত করেন এবং হাদিস শেখা শুরু করেন।

তিনি নাফি এবং ইবনে শিহাব জাহরীর মতো মদিনার বিখ্যাত আলেমদের অধীনে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি মদিনাবাসীদের জীবন পদ্ধতি থেকেও

শিক্ষা নিয়েছেন কারণ মদিনা ছিল নবীর শহর।

ইমাম মালেক হাদিস সংকলনে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি একটি বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ রচনা করেন মুওয়াত্তা এই বইটিতে তিনি কুরআন, হাদিস এবং মদিনাবাসীর আমলের ভিত্তিতে আইনশাস্ত্রের মূলনীতি ব্যাখ্যা করেছেন।

তাঁর "মুতা" ছিল ইসলামের বিশ্বের প্রথম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদিস সংগ্রহের একটি। তিনি শুধুমাত্র সহীহ হাদিস সংগ্রহ করতেন এবং আত্মস্তুত যত্ন

সহকারে ফতোয়া দিতেন।

ইমাম মালিক ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও ধৈর্যশীল। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন, "জ্ঞান শিখতে হলে নষ্ট হতে হবে।" হাজার হাজার শিক্ষার্থী তার কাছে পড়তে আসত। সে মসজিদে নবী আমি শিক্ষা দিতাম, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করতেন। তার শিক্ষা উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর আইনশাস্ত্র "মালিকি ধর্ম" নামে পরিচিতি লাভ করে।

ইমাম মালিক উমাইয়া ও আববাসীয় খলিফার আমলে বেঁচে ছিলেন। তারা কখনোই নিষ্ঠুরতা মেনে নেয়নি। আববাসীয় খলিফা মনসুর তাকে বাগদাদে ডেকে পাঠান, কিন্তু তিনি মদিনা ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলতেন, আমি নবীর শহরে বাস করব এবং ইসলামের খেদমত করব। তিনি ১৭৯ হিজরিতে মদিনায় ইস্তেকাল করেন। তাদের জামাত আল-বাকী আমাকে কবর দেওয়া হল।

ইমাম মালিকের মালেকী ধর্ম আজও উত্তর আফ্রিকা এবং অন্যত্র অনুসরণ করা হয়। তিনি ছিলেন হাদিসের একজন প্রকৃত হেফাজতকারী এবং ইসলামের একজন মহান আলেম। এই গল্প আমাদের শিক্ষা দেয় যে হাদিস ও সত্যের প্রতি ভালোবাসা ইসলামের দিকে নিয়ে যায়।

১৮-১৬০ মি, ১০ জনে, ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ •

১৫-১ মি, ১০ জনে, ইবনে হাজার, সত্যতা •

ইমাম মালিক রহ মুওয়াত্তা, ভূমিকা, পৃষ্ঠা 1-10 •

১২২০-১০০ মি, ৮৫, সোনালী আভিজাত্য ঘোষণার প্রক্রিয়া •

1. ইমাম মালিকের আসল নাম কী?
 2. ইমাম মালিক কোন বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ লিখেছিলেন?
 3. ইমাম মালিক কোথা থেকে শিক্ষা লাভ করেন?
 4. ইমাম মালিক কোথায় শিক্ষা দিতেন?
 5. ইমাম মালিক কেন বাগদাদে যেতে অস্থীকার করলেন?
 6. ইমাম মালিককে কোথায় দাফন করা হয়?
-

(51)

ইমাম শাফেঈ ও শাফেঈ ফিকাহ শাস্ত্রে কাহিনী

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে গাজা আমি একজন মহান পণ্ডিত জন্মেছি। তাঁর নাম

ছিল মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস শাফিউল্লাহ, যিনি ইমাম শাফিউল্লাহ নামে পরিচিত ছিলেন।

তিনি ইসলামী আইনশাস্ত্রের একজন মহান ইমাম এবং শফি মাযহাবের
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই গল্পটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে জ্ঞান অর্জনের জন্য
কঠোর পরিশ্রম এবং সত্ত্বের প্রতি ভালবাসা প্রয়োজন।

ইমাম শাফিউল্লাহ 150 হিজরিতে গাজায় জন্মগ্রহণ করেন, তবে তাঁর শৈশব
কেটেছে মঞ্চায়। তিনি কুরাইশ বংশের সন্তান পরিবারভুক্ত ছিলেন। শৈশবে
তাঁর পরিবার খুব দরিদ্র ছিল, কিন্তু তাঁর মা তাঁকে জ্ঞানের পথে পরিচালিত
করেছিলেন। সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন মুখ্যস্ত করেন। তিনি মঞ্চার
আলেমদের কাছ থেকে হাদীস ও আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি
মদীনায় গিয়ে ইমাম মালিক রহ মুওয়াত্তা পড়াশুনা করেছে।

ইমাম শাফিউল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী। তিনি বাগদাদে
গিয়ে ইমাম আবু হানিফার ছাত্রদের কাছ থেকে হানাফী আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন

করেন। তিনি কুরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের মতামত ও যুক্তি একত্রিত করে একটি নতুন আইনশাস্ত্র তৈরি করেন। তারা "মা" একটি বিখ্যাত বই লিখেছেন, যেখানে তাঁর আইনশাস্ত্রের নীতিগুলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। তার পদ্ধতিটি "শাফিয়ি স্কুল অফ জুরিসপ্রস্টেন্স" নামে পরিচিত হয়।

ইমাম শাফেঈ অত্যন্ত বিনয়ী ও ধার্মিক ছিলেন। তিনি বলতেন, "জ্ঞান ছাড়া ইসলাম বোঝা যায় না।" তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে হাদীসের প্রতি শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন। তিনি মঙ্গা, বাগদাদ ও মিশরে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর শিক্ষা সমগ্র পূর্ব এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আলেমদের সাথে কথা বলতেন এবং সর্বদা সত্যের পক্ষে থাকতেন।

ইমাম শাফিঈ আববাসীয় খলিফাদের আমলে বেঁচে ছিলেন। তারা কখনোই নিষ্ঠুরতা মেনে নেয়নি। তাকে একবার রাষ্ট্রদ্বোহের দায়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু পরে খালাস পেয়েছিলেন। সারাজীবন কাটিয়ে দিলেন মিশর আমি 204 হিজরিতে মিশরে ইস্তেকাল করেছি। তাদের জনশূন্যতা তাকে (প্রাচীন কায়রো) দাফন করা হয়। হাজার হাজার মানুষ তার জানাজায় অংশ নেন।

ইমাম শাফি'র চিন্তাধারা আজও অনেক মুসলমান অনুসরণ করে। তিনি ছিলেন
জ্ঞানী, নম্র এবং ইসলামের একজন খাঁটি সেবক। এই গল্প আমাদের শেখায় যে
জ্ঞান, হাদিস এবং প্রেম ইসলামের পথ দেখায়।

রেফারেন্সের জন্য ইঙ্গিত:

১৫০-২৭০ ম', ১০৫, ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ •

১১২০-১০০ ম', ১৫, ইবনে হাজার, সভ্যতা •

ইমাম শাফেয়ের রহ মা, ভূমিকা, পৃষ্ঠা 1-15 •

৫০-৭০ ম', ১০৫, সোনালী আভিজাত্য ঘোষণার প্রক্রিয়া •

1. ইমাম শাফেয়ীর আসল নাম কি?
 2. ইমাম শাফেয়ী কত বয়সে কুরআন মুখ্যস্থ করেন?
 3. কোন ইমাম শাফেয়ী হাদিস শিখেছিলেন?
 4. ইমাম শাফেয়ী কোন বিখ্যাত আইনশাস্ত্র গ্রন্থ লিখেছিলেন?
 5. ইমাম শাফেয়ীকে কোন শহরে দাফন করা হয়?
 6. ইমাম শাফেয়ীর আইনশাস্ত্র পদ্ধতির নাম কি?
-

(52)

ইমামআহমদ বিনহাস্বল এবং হাস্বলী আইনশাস্ত্রের কাহিনী

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে বাগদাদে একজন মহান আলেম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাস্বল, যিনি ইমাম আহমদ বিন হাস্বল নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি হাদীসের একজন মহান রক্ষক এবং হাস্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই গল্প আমাদের বিপদের মুখেও সত্যের পক্ষে অটল থাকতে শেখায়।

ইমাম আহমদ ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার ছিল ধার্মিক। ছোটবেলায় তাঁর বাবা মারা গেলেও তাঁর মা তাঁকে জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেছিলেন। তিনি পবিত্র কোরআন মুখ্যস্থ করেন এবং বাগদাদের আলেমদের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি ইমাম শাফেই (র.)-এর কাছেও পড়াশোনা করেছেন। তিনি হাজার হাজার হাদীস মুখ্যস্থ করেছেন এবং মুসনাদে আহমাদ নামক হাদীসের একটি বিখ্যাত সংকলন প্রস্তুত করেন। ইমাম আহমাদ একটি আইনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন যাতে তিনি কুরআন ও হাদীসকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। তিনি বলতেন, হাদীস ছাড়া ইসলাম বোঝা যায় না। তাঁর আইনশাস্ত্র "হাস্বলী মাযহাব" নামে পরিচিতি লাভ করে। তিনি তার

সাহাবীদেরকে সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ফতোয়া জারি করতে
শিখিয়েছিলেন। তার শিক্ষা আরব উপন্থীপ এবং অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম আহমদের জীবনে একটি বড় পরীক্ষা ছিল। আববাসীয় খলিফা মামুন ও
মুতাসিম "কুরআনের সৃষ্টির পরীক্ষা" নামে একটি আন্দোলন শুরু করেন তিনি
বলেন, কুরআন সৃষ্টি, অপ্রস্তুত নয়। ইমাম আহমাদ এ মতবাদের বিরুদ্ধে
অবস্থান নেন। তিনি বলেন, কুরআন আল্লাহর বাণী, সৃষ্টি হয়নি। এ কারণে
তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তাদের চাবুক মারা হয়েছিল, কিন্তু তারা
সত্যকে ছাড়েনি। তার ধৈর্য মুসলমানদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

পরে খলিফা মুতাওয়াক্তুল "কুরআনের সৃষ্টির পরীক্ষা" বন্ধ করে ইমাম
আহমদকে মুক্ত করেন। তিনি বাগদাদে ফিরে এসে শিক্ষকতা শুরু করেন।
তিনি 241 হিজরিতে বাগদাদে ইস্তেকাল করেন। তার অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ায় প্রায়
800,000 পুরুষ এবং 60,000 মহিলা অংশগ্রহণ করেছে। তাকে বাগদাদে
সমাহিত করা হয়।

ইমাম আহমদের হাম্মলী মাযহাব আজও অনেক মুসলমান অনুসরণ করে।
তিনি ছিলেন হাদীসের রক্ষক, সত্যের বলিষ্ঠ সমর্থক এবং ইসলামের একজন
মহান আলেম। জীবনের ঝুঁকি থাকলেও এই গল্প আমাদের সত্যের জন্য লড়াই
করতে শেখায়।

 রেফারেন্সের জন্য ইঙ্গিত:

১২-১০ম, ১১ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ, J •

২০০-২৩০ম, ॥৫, সোনালী আভিজাত্য ঘোষণার প্রক্রিয়া •

মুসনাদে আহমাদ, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১-১৫ •

১৫০-১৭০ম, ॥৫, ইবনে হাজার, সভ্যতা •

1. ইমাম আহমাদ ইবনে হাষ্বলের আসল নাম কি?
2. হযরত ইমাম আহমাদ (রা.) এর বিখ্যাত হাদীস সংকলন কোনটি?
3. ইমাম আহমাদ (রা.) আইনশাস্ত্রে কোন বিষয়কে সবচেয়ে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন?
4. 'কুরআন সৃষ্টির পরীক্ষা' সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (রাঃ) এর অবস্থান কী ছিল?
5. কোন খলিফা ইমাম আহমদকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন?
6. ইমাম আহমাদ কোন শহরে মৃত্যুবরণ করেন?

(53)

মামুন আল-রশিদ এবং আববাসীয় খিলাফতে জ্ঞানের উত্থানের গল্প

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে আববাসীয় খিলাফত বিশ্বের সবচেয়ে বড় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। হারুন আল রশিদের পুত্র খলিফা মামুন আল-রশিদের শাসনামলে বাগদাদে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এই গল্প আমাদের শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা ইসলামী রাষ্ট্রকে মহান করে তোলে।

মামুন আল-রশিদ 170 হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার ভাই আমিনের সাথে খিলাফত যুদ্ধ করেন। 195 হিজরীতে বিজয় লাভ করে এবং 198 হিজরীতে খেলাফতের অঙ্গীকার প্রকাশ্যে আসে। তিনি বিজ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত জ্ঞানী ও আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলতেন, জ্ঞান আল্লাহর দান, তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি তার পিতা হারুন আল-রশিদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "বায়তুল হিকমাহ" এর প্রসার ঘটান এবং এটিকে একটি গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করেন।

বায়তুল হিকমাহ ছিল একটি বিশাল গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র। মামুন গ্রীক, ফার্সি, ভারতীয় ও চীনা বই সংগ্রহ করেন। তিনি বিখ্যাত অনুবাদকদের ডেকে তাদের আরবীতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য পশ্চিতরা বাগদাদে আসেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আল-খোয়ারিজমি গণিতের উপর একটি বই লিখেছিলেন যেখান থেকে "বীজগণিত" শব্দটি এসেছে। হনাইন বিন ইসহাক গ্রীক দার্শনিকদের বই অনুবাদ করেন।

মামুন নিজেও জ্ঞানের আলোচনায় অংশ নিতেন। তিনি বাগদাদে একটি মানমন্দির তৈরি করেছিলেন যেখানে পশ্চিতরা তারা পর্যবেক্ষণ করতেন। তারা পৃথিবীর পরিধি পরিমাপের জন্য একটি দল পাঠায়। তাঁর সময়ে ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্বে অগ্রসর হয়। তিনি আলেমদের সম্মান করতেন এবং তাদের জন্য নির্দিষ্ট উপবৃত্তি নির্ধারণ করতেন।

কিন্তু মামুনের শাসনামলে কিছু সমস্যা ছিল। তিনি "কুরআনের সৃষ্টির পরীক্ষা" নামে একটি আন্দোলন শুরু করেন, যা কোরান সৃষ্টির তত্ত্বটি প্রস্তাব করে। ইমাম আহমদ বিন হাস্বল এ মতবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। মামুন ইমাম আহমদ বিন হাস্বলকে জেলে পাঠান। এ ঘটনা অনেক মুসলমানকে ব্যথিত করেছে। মামুন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং অনেক স্থান জয় করেন। কিন্তু

জীবনের শেষ দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং 218 হিজরিতে তারসুসে

(আধুনিক তুরঙ্গ) মৃত্যুবরণ করেন।

মামুন আল-রশিদের শাসনামল ছিল ইসলামী জ্ঞানের স্বর্ণযুগ। তিনি ছিলেন জ্ঞানী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং ইসলামের প্রতি নির্বোদিতপ্রাণ। এই গল্প আমাদের শিক্ষা দেয় যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা ইসলামী রাষ্ট্রকে মহান করে তোলে।

রেফারেন্সের জন্য ইঙ্গিত:

১১২০-১০০ মু, ৭৫, তাবারীর ইতিহাস উম্মাহ ও রাজাদের ইতিহাস •

২১০-২৯০ মু, ১০৫, ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ •

২০০-২২০ মু, ৮৫, মাসুদি, জনপ্রিয় সোনা •

৩০০-৩২০ মু, ৩৫, জ্যাকোবি, জ্যাকোবিয়ান ইতিহাস •

1. মামুন আল-রশিদ কোন খলিফা ছিলেন?

2. মামুনুল রশীদ জ্ঞানের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ করেছিলেন?

3. "বীজগণিত" শব্দটি কোন বিজ্ঞানীর বই থেকে এসেছে?
 4. মামুন আল-রশিদ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য কী তৈরি করেছিলেন?
 5. মামুন আল-রশিদ কুরআন সম্পর্কে কোন আন্দোলন শুরু
করেছিলেন?
 6. মামুন আল-রশিদ কোথায় মারা যান?
-

(54)

বাগদাদের ধ্বংস: হালাকু খানের আক্রমণের গল্প

সপ্তম শতাধিক হিজরিতে (1258 খ্রিস্টাব্দ) ইসলামের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদে এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। মঙ্গোল নেতা হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করে শহর ধ্বংস করেন। এই ঘটনাটি আববাসীয় খিলাফতের সমাপ্তি এবং ইসলামী জ্ঞানের বিরাট ক্ষতিকে চিহ্নিত করে। এই গল্প আমাদের শেখায় যে বিভেদ ও দুর্বলতা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেয়।

বাগদাদ ছিল ইসলামী বিশ্বের রাজধানী। এ বিষয়ে আববাসীয় খিলিফা ড মুন্তাসিম বাল্লাহ এর সরকার ছিল কিন্তু তার শাসন দুর্বল ছিল। মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক কলহ বৃদ্ধি পায়। সে সময় মধ্য এশিয়ার একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী মঙ্গোলরা ইসলাম বিশ্বের দিকে এগিয়ে আসছিল। তাদের নেতা ছিলেন চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খান।

হালাকু খান প্রথম পারস্যের কিছু শহর ধ্বংস করেন। তিনি খিলিফা বাগদাদকে আত্মসমর্পণ করতে লিখলেন নতুন শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু খিলিফা মুন্তাসিম এই ভ্রকিকে গুরুত্বের সাথে নেননি। তিনি তার সেনাবাহিনীকে

শক্তিশালী করেননি। হালাকু 1258 সালে একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে বাগদাদ
অবরোধ করেন। তার সাথে ছিল হাজার হাজার মঙ্গোল সৈন্য এবং উন্নত অস্ত্র।

মঙ্গোলরা বাগদাদের দেয়াল ভেঙ্গে শহরে প্রবেশ করে। তারা মসজিদ,
গ্রন্থাগার ও বাড়িগুর ধ্বংস করে। বাইত আল হিকমা লক্ষ লক্ষ বই টাইগ্রিস
নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। নদীর পানি কালি দিয়ে কালো হয়ে গেল। হাজার
হাজার মুসলমান, আলেম ও সাধারণ মানুষ শহীদ হন। খলিফা মুঙ্গাসিম ও তার
পরিবারকে বন্দী করে হত্যা করা হয়। এর মাধ্যমে আববাসীয় খিলাফতের
অবসান ঘটে।

বাগদাদের ধ্বংস মুসলমানদের জন্য একটি বড় ট্র্যাজেডি ছিল। বাগদাদ, যেটি
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্ঞানের কেন্দ্র ছিল, তা ধূলায় পরিণত হয়। কিন্তু
মুসলমানরা সাহস হারায়নি। পরবর্তীতে আববাসীয় খিলাফত প্রতীকীভাবে
মিশরে মামলুক সাম্রাজ্যের অধীনে আবার শুরু হয়েছে, যদিও শুধুমাত্র নামে।
হালাকোর পর তার নাতি গাজান খান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুসলিম রাষ্ট্রের
অংশ হন।

বাগদাদের ঘটনা মুসলমানদের জন্য শিক্ষণীয়। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে
যখন মুসলমানদের এক জন ও শক্তির অভাব হয়, তখন শক্তরা সুবিধা নেয়। তবুও
মুসলমানরা তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস নিয়ে আবার জেগে উঠেছে।

 রেফারেন্সের জন্য ইঙ্গিত:

—২০০ মি, ১৩৫, তাবারীর ইতিহাস উস্মাহ ও রাজাদের ইতিহাস •

২২০

২০০—২৩০ মি, ১৩৫, ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ •

৩৫০—৩৭০ মি, ১২৫, ইবনে আথির, আল-কামাল ফী আল-তারিখ •

১৫০—১৭০ মি, ১৫, রশিদউদ্দিন ফজলুল্লাহ, জামে আল-তাওয়ারীখ •

1. হলাণ্ড খান কোন সালে বাগদাদ আক্রমণ করেন?
2. বাগদাদে হামলার সময় খলিফা কে ছিলেন?
3. হলাণ্ড খান কি একজন বিখ্যাত মঙ্গোল নেতার নাতি ছিলেন?
4. জানের ঘরের বইগুলি কোথায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল?
5. বাগদাদ ধ্বংসের পর আববাসীয় খিলাফত প্রতীকী ভাবে কোথায় শুরু হয়েছিল?
6. হলাণ্ড খানের নাতি গজান খান পরে কী করেছিলেন?

(55)

মামলুক সাম্রাজ্যের উত্থান এবং সালাদিন আইযুবীর বিজয়ের গল্প

হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যখন মঙ্গোল ও কুসেডারদের আক্রমণে মুসলিম বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, তখন মিশরে এক নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটে। এটি ছিল মামলুক সাম্রাজ্য। এই সময়ের অন্যতম মহান বীর ছিলেন সালাদিন আইযুবি, যিনি জেরুজালেম জয় করে মুসলমানদের গৌরব পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে সাহস, ন্যায়বিচার এবং ঐক্যের মাধ্যমে মহান বিজয় অর্জন করা যায়।

মামলুকরা ছিল মিশরের আইযুবী শাসকদের দ্বারা তুর্কি ও মধ্য এশীয় অঞ্চল থেকে ক্রয়কৃত গ্রীতিদাস সৈন্য এবং সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং যুদ্ধে দক্ষ ছিলেন। ৬৪৮ হিজরিতে (১২৫০ খ্রি.) মঙ্গোলদের আক্রমণের সময় আইযুবী সুলতানদের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। মামলুক সেনাপতিরা ক্ষমতা দখল করে এবং তাদের মধ্যে প্রথম সুলতান ইজেদ্দিন আইবাক এভাবেই মামলুক সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।

কিন্তু এই গল্পের আসল নায়ক মামলুকদের আগে মিশর ও সিরিয়ায় আইযুবী রাজবংশের নেতা সালাদিন আইযুবী। সালাউদ্দিন ৫৩২ হিজরিতে (১১৩৭

খ্রিস্টাব্দ) ইরাকের তিকরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুর্দি বংশোদ্ধৃত ছিলেন এবং তার পিতা একজন জেনারেল ছিলেন। সালাউদ্দিন ছোটবেলা থেকেই সাহসী ও ধার্মিক ছিলেন। তিনি দামেক্ষে বড় হয়েছেন এবং মার্শাল আর্ট এবং ইসলামিক স্টাডিজ অধ্যয়ন করেছেন।

সালাউদ্দিন তার চাচা শিরকুহের সাথে মিশরে যান এবং ফাতেমীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। শিরকুহের মৃত্যুর পর সালাউদ্দিন মিশরের শাসক হন। তিনি মিশরে সুন্নি ইসলাম পুনরুদ্ধার করেন এবং আইয়ুবী রাজবংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তিনি বললেন, আমি মুসলমানদের একত্র করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তারা সিরিয়া, ইয়েমেন এবং উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ জয় করেছিল।

সালাউদ্দিনের সবচেয়ে বড় জয় হাতিনের যুদ্ধ (583 হি/1187 খ্রিস্টাব্দ) তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একটি বড় সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। তাদের বাহিনী ক্রুসেডারদের পরাজিত করে জেরজালেমের রাজা গাইটসকে বন্দী করে। এই বিজয়ের পর সালাউদ্দিন জেরজালেম জয় করেন। তারা খ্রিস্টানদের প্রতি দয়া দেখিয়েছিল এবং তাদের নিরাপদে চলে যেতে দিয়েছিল। তিনি বলেন, ইসলাম শান্তি ও ন্যায়ের ধর্ম।

কিন্তু ক্রুসেডাররা হাল ছাড়েন। ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড দ্য লায়নহার্ট তৃতীয় ক্রুসেড নিয়ে এসেছিল। সালাউদ্দিন তার সাথে অনেক যুদ্ধ করেছেন।

অবশ্যে, তারা একটি শান্তি চুক্তিতে আলোচনা করে যেখানে জেরুজালেম
মুসলিমদের হাতে ছিল, কিন্তু খ্রিস্টানদের দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

সালাউদ্দিন ৫৮৯ হিজরিতে (১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ) দামেক্ষে মৃত্যুবরণ করেন।
মৃত্যুর সময় তার খুব কম সম্পত্তি ছিল, কারণ তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সবকিছু
বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

মামলুকরা পরবর্তীতে সালাদিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তারা মঙ্গোলদের
বিরুদ্ধে আইন গলিয়াথের যুদ্ধ (658 হি/1260 খ্রিস্টাব্দ) আমি জিতেছি।
মামলুক সাম্রাজ্য মিশর ও সিরিয়ায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সালাদিন এবং
মামলুকদের কাহিনী মুসলমানদের জন্য একটি বড় উদাহরণ। এই গল্পটি
আমাদের শেখায় যে সাহস ও ন্যায়বিচারের সাথে মুসলমানরা মহান বিজয়
অর্জন করতে পারে।

রেফারেন্সের জন্য ইঙ্গিত:

- ইবনে কাসির রহ শুরু এবং শেষ, J12, মু ২০০-২৫০
- ইবনে আথির, আল-কামাল ফৌ আল-তারিখ, মু, || তৃ ৩৫০-৮০০
- বাহাউদ্দিন বিন শাদাদ, আল-সিরাত আল-নুরিয়া, মু ১০০-১৫০

- মাকরিজি, রাজাদের দেশ জেনে আচরন, ভলিউম ১, পৃ. 150-

180

1. সালাহউদ্দিন আইযুবী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
2. কোন যুদ্ধে সালাহউদ্দিন খুসেডারদের পরাজিত করেছিলেন?
3. জেরজালেমের রাজার নাম কি?
4. সালাহউদ্দিন মিশরে কোন ইসলামী সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন?
5. মঙ্গলদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে মামলুকরা জয়ী হয়েছিল?
6. সালাহউদ্দিন কোন শহরে মারা যান?